অনীক

ডিসেম্বর ২০১১
বর্ষ ৪৮ q সংখ্যা ৬

সম্পাদকীয় q ১

কিষেনজি হত্যা

আলাপ... ও সাজানো সংঘর্ষ q সিডিআরও q ২
কিষেনজি-র মৃত্যু-রহস্য! q ট্রেভর সেভ্‌ল্যাম q ৪
কিষেনজির মৃত্যু... q প্রবীণ রায় q ১

ঘটনাপ্রবাহ

পরিবর্তন-এর জঙ্গলমহল... q শ্যামল দাস q ৬
এপিডিআর-মেট্রো চ্যানেল বিতর্ক q প্রতিবেদক q ৭
আবার ভোপাল q শুভাশিস মুখোপাধ্যায় q ৮
পঞ্চায়েতরাজ... q রণেশ রায় q ৯
নিউক্লিয়ার জ্বালানি q শুভাশিস মুখোপাধ্যায় q ১১

পত্রপত্রিকা থেকে

বিদ্যুতের চার্জ বৃদ্ধি ও একটি মিথ্যা গল্প q ১২

বক্তৃতা

এই সংগ্রাম কল্পনাকে... q অরুন্ধতী রায় q ১৩

স্মরণ

স্মরণ : ভূপেন হাজারিকা q ১৪
শৈবাল মিত্র স্মরণে q ১৫

প্রবন্ধ

লিবিয়া ও আমেরিকার আফ্রিকা... q দীপ্র চৌধুরী q ১৬
ডলার-সংকটের নেপথ্য কাহিনী q ১৯
জইতাপুর... q শুভাশিস মুখোপাধ্যায় q ২০
শিক্ষা অর্ডিন্যান্স q সলিল বিশ্বাস q ২২
বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স q দেবর্ষি চক্রবর্তী q ২৬
দারিদ্রের রেখাচিত্র q প্রণব দে q ২৮
রাজনীতি তলিয়ে যায়.. q সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় q ৩২
'আধার'... q সমরেশ মিত্র q ৩৬

কবিতা

যুদ্ধ q অশোক চট্টোপাধ্যায় q ৩১
'স্বপ্ন' q অর্জুন রায় q ৩১

বার্ষিক সূচি : ২০১১ q ৩৯

যোগাযোগ, লেখা, চিঠিপত্র ও টাকা-পয়সা পাঠাবার ঠিকানা:
প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট। কলকাতা ৭০০০০৯
কার্যালয় :
১১, রাজা রামমোহন সরণী। কলকাতা ৭০০ ০০৯
(মঙ্গলবার : সন্ধ্যা সাতটা থেকে সাড়ে আটটা)

সম্পাদকমণ্ডলী : **দীপংকর চক্রবর্তী রতন খাসনবিশ সুমিতা সিদ্ধার্থ শুভাশিস প্রণব**

äÆ î˜Nðî

এখানে থেমো না!

পশ্চিমবঙ্গে আজ থেকে মাত্র ছ'মাস আগে ৩৪ বছরের ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারকে জনগণ ক্ষমতাচ্যুত করেছেন সমাজ ও রাজনীতির গণতন্ত্রীকরণের লক্ষ্যে। যদিও তাদের বদলে জনগণের রায়ে মসনদে বসেছে কংগ্রেসের তৃণমূল ও মূল অংশের জোট, স্পষ্টতই যাদের মূল অভিমুখ দক্ষিণপন্থার দিকে, তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় প্রভৃতি আন্দোলনকে ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা অভূতপূর্ব যে গণজোয়ারের ভেলায় চড়ে এই জোট ক্ষমতা দখল করতে পেরেছে, সেই লড়াইয়ের মূল চরিত্র ছিল বামপন্থী। প্রাক্-নির্বাচনী প্রচারে, বক্তব্যে, শ্লোগানে ও প্রতিশ্রুতিতে ছিল বামপন্থার ছাপ। দক্ষিণপন্থী রাজনীতির উত্তরাধিকার বহন করে এলেও বামপন্থী ভাবমূর্তিই ছিল তাদের নির্বাচনী জয়ের ভিত্তি।

বিগত ছ'মাসে এই নতুন সরকারের কার্যকলাপ ও বিবিধ সংলাপের মধ্যে দিয়ে যে বার্তা মানুষের কাছে এসে পৌঁছেছে, তাতে মানুষের বিপদে সরকারের মূল শক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত অতি-সক্রিয়তা যেমন ব্যতিক্রমী ইতিবাচক দৃষ্টান্ত হিসেবে উঠে এসেছে, তেমনি পেট্রোলের মূল্যবৃদ্ধির বিরোধিতা, এবং বিশেষত খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার তথা কংগ্রেসের বিরোধিতা করে তাদের পিছু হটতে বাধ্য করার মধ্য দিয়ে প্রধান শাসক দলের প্রাক্-নির্বাচনী অবস্থানের ধারাবাহিকতার কিছু নজিরও মিলেছে। কিন্তু সমাজ ও রাজনীতির গণতন্ত্রীকরণের লক্ষ্যটি? সেখানেই ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে উঠছে অন্ধকার।

গণতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো ব্যক্তির ও বিভিন্ন সংস্থার— বিশেষ করে বিরোধীদের— মতপ্রকাশের অধিকার, সংগঠিত হবার অধিকার, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকার। বিগত সরকারের আমলে শাসক দলের বিরুদ্ধে বড়ো অভিযোগের জায়গা ছিল এটিই। নতুন সরকারের আমলে দলতন্ত্রের বিপরীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে— এটিই ছিল ব্যাপক মানুষের প্রত্যাশা। সে প্রত্যাশা নিয়েই জিজ্ঞাসা চিহ্ন ক্রমশ বড়ো হয়ে উঠছে। বিগত শাসক দলের মতো একই রকমভাবে পাড়া দখল, তোলা আদায়, গায়ের জোরে শ্রমিক ইউনিয়ন বা কলেজ ইউনিয়ন দখলের প্রক্রিয়া ক্রমশ দৈনন্দিন কর্মসূচিতে পরিণত হচ্ছে। পুলিশের হাতে লাঠির ও গ্রেপ্তারের স্বাদ পাচ্ছেন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররাও— বোমাবাজি বা সতীর্থের চোখ নষ্ট করার অভিযোগে নয়, শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করতে গিয়েই— তার পেছনেও সরকার-বিরোধী ছাত্রদের বামপন্থী রাজনীতিকে বিনাশ করার প্রচেষ্টা। মানবাধিকার সংগঠনের সভা পণ্ড করার প্রচেষ্টা এবং মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মীদের 'মাওবাদী' বলে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টাগুলি অনতি-অতীতে বামফ্রন্ট সরকারের প্রচেষ্টাগুলির কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।

এবং সবটাই হচ্ছে নেত্রীর জয়ধ্বনি তুলতে তুলতে। নেত্রীই হয়ে উঠছেন সমগ্র দলের সমার্থক, সম্ভবত দলেরও উপরে, দলে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বালাই নেই— ব্যক্তিতন্ত্রই হয়ে উঠছে গণতন্ত্রের অন্য নাম! একই সঙ্গে চলছে পুরোনো জমানার পার্টিতন্ত্রের বিরুদ্ধে মানুষের গভীর বিক্ষোভকে পুঁজি করে 'রাজনীতির রঙ' মুছে ফেলার অজুহাতে ব্যক্তিতন্ত্র তথা নিয়ন্ত্রিত আমলাতন্ত্র তথা পরোক্ষে শাসক দলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা— শিক্ষাক্ষেত্রে, পঞ্চায়েত ব্যবস্থায়। এর সঙ্গে যোগ করুন, রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পাননি, নন্দীগ্রামের জন্য দোষীদের শাস্তি দেওয়ার পথে এক পাও এগোয় নি নতুন সরকার, সেখানে আহত বা নিহতদের পাশে দাঁড়ানোর পথেও না। সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণ করলেও সিঙ্গুরের চাষিদের সমস্যার কোনও সুরাহা হয় নি। বারবার নতুন চাকরির ঘোষণা হলেও নতুন চাকরি হয় নি। জেলায় জেলায় একশো দিনের কাজে একই রকম শ্লথগতি। গ্রামীণ বয়স্কদের, বিধবাদের, পরিবহণ কর্মীদের পেনশন আটকে।

আমাদের মূল প্রশ্ন একটিই। বামফ্রন্ট সরকারের জমানায় সিপিআই(এম)-এর পার্টিতন্ত্রের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক সমাজ এক অসাধারণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। আজ যখন নতুন করে পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে সেই চরম অশুভ প্রবণতারই নতুন রঙে প্রত্যাবর্তনের, তখন তাঁরা কি চুপ ক

কিষেনজি হত্যা

আলাপ আলোচনা বন্ধ করা ও সাজানো সংঘর্ষ

কোঅর্ডিনেশন অফ ডেমোক্রাটিক রাইট্স অর্গানাইজেশন্স (সিডিআরও)

q সিপিআই (মাওবাদী) নেতা কোটেশ্বর রাও তথা কিষেনজির মৃত্যু প্রসঙ্গে সরকারি ব্যাখ্যা সম্পর্কে সন্দেহ ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছে। ভারতের সমস্ত মানবাধিকার সংগঠনগুলি তো বটেই, এমনকি কিছু কিছু সংসদীয় দল বা সাংসদ, কিংবা স্বামী অগ্নিবেশের মতো দল-নিরপেক্ষ সমাজকর্মীরা পর্যন্ত সরকারি বক্তব্য মেনে নিতে অস্বীকার করছেন, সর্বস্তরে তা নিয়ে যুক্তিযুক্তভাবেই নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি উঠছে। ভারতের বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত রাষ্ট্রীয়বাহিনী কর্তৃক 'সংঘর্ষ'-এর গল্প ফেঁদে রাষ্ট্রশক্তির মৌলিকভাবে বিরোধীদের নৃশংসভাবে হত্যা করার 'ঐতিহ্য'-র প্রমাণ মিলছে সেই সত্তরের দশক থেকেই। ফলত এই 'ঘটনা'টিকেও তারই ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখাটা খুবই স্বাভাবিক। '*অনীক*'-ও তাই কিষেনজির মৃত্যু সম্পর্কে দ্রুত নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলছে।

কিষেনজি শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন সমাজ-বিপ্লবের লক্ষ্যেই। তাই *অনীক*, প্রয়াত কিষেনজি ও তাঁর দলের অনুসৃত রণনীতি ও রণকৌশল এবং অনুসৃত বহু কর্মপন্থার মতাদর্শগতভাবে বিরোধিতা সত্ত্বেও, তাঁর আদর্শের ও আত্মত্যাগের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছে। q

১ ডিসেম্বর, ২০১১ সিপিডিআর-এর অন্তর্ভুক্ত চারটি সংগঠন, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর), অন্ধ্রপ্রদেশ সিভিল লিবার্টিস কমিটি (এপিসিএলসি), বন্দীমুক্তি কমিটি ও পিপ্‌লস্ ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রাটিক রাইট্স (পিইউডিআর, দিল্লী)-এর বাইশ সদস্যবিশিষ্ট একটি টিম মাল্লজুলা কোটেশ্বর রাও ওরফে কিষানজির সংঘর্ষে মৃত্যু বিষয়ে তথ্য উদঘাটন করার কাজ হাতে নেয়। টিমটি বুড়িশোলের সোরাকাটা গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরের গোসাইবাঁধ গ্রাম পরিদর্শন করে, এই দুই গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে এবং জামবনি থানার সাব-ইন্সপেক্টর ও এএসআই-এর সাথে কথাবার্তা বলে এবং সংবাদ বর্ণিত সংঘর্ষের স্থান পরিদর্শন করে।

স্থান

কিষেনজির দেহটি যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেই স্থানটি বুড়িশোল গ্রামের সোরাকাটা অঞ্চল থেকে মোটামুটি ৩০০ মিটার দূরত্বে। গ্রামের ফুটবল খেলার মাঠের থেকে ৫০ মিটারও নয়। চারদিক শাল বনে ঢাকা। দেহটি যেখানে পড়ে ছিল তার ঠিক পাশেই একটা উইঢিবি। চারপাশে শাল গাছের হালকা আচ্ছাদন। তাতে বিশেষ কিছু ঢাকা পড়ে না। এত বড় তথাকথিত সংঘর্ষের পরেও উইঢিবির কোনও ক্ষতি হয় নি। যেখানে দেহটি শায়িত ছিল সেখানে তাঁর মাথা ও শরীরের উপরাংশের দিকে রক্ত রয়েছে। কিন্তু যেখানে তাঁর পাগুলো ছিল সেখানে রক্ত নেই। যেসব গাছে বুলেটের দাগ রয়েছে বলা হচ্ছে সেগুলোতে বুলেটে পোড়ার চিহ্ন নেই। দেহটিতে এত ক্ষত, অথচ যেখানে দেহটি পাওয়া গেল সেই জায়গাটা এমন অক্ষত, এতে বেশ সন্দেহ জাগে।

যদি দারুন গুলি বিনিময় চলে থাকে তবে চারপাশে তো তার পরিষ্কার চিহ্ন পাওয়া যাবে। সবচেয়ে অদ্ভুত হলো উইঢিবিটি। মৃতদেহটি থেকে মাত্র ইঞ্চি কয়েক দূরে, অথচ এত গোলাগুলিতে তার কোনো ক্ষতিই হয়নি। শুকনো পাতাতেও গুলির আগুনের ফুলকি থেকে আগুন ধরার কোনো চিহ্ন নেই। টীমের সদস্যরা চারপাশে ঘুরে দেখেন গাছগুলিতে বা উইঢিবিগুলিতে বুলেটের চিহ্ন বা অন্য কোনো চিহ্ন আছে কিনা, কিন্তু কয়েকটি গাছে কাটা দাগ পাওয়া গেলেও একটি উইঢিবিরও কোনো ক্ষতি হয়নি, রাইফেলের গুলি ও মর্টার দাগার ফলে আগুনে পোড়ার কোনো চিহ্ন দেখা যায় নি।

গ্রামবাসীদের বয়ান

সোরাকাটা গ্রামে আমাদের বলা হয়েছে যে ঘটনার দু দিন আগে এলাকায় সুরক্ষা-বাহিনীর যাতায়াত স্পষ্ট হয়। ২৪ নভেম্বর বেলা ১০-১১টার সময় তা চরমে ওঠে। পুলিশ গ্রামবাসীদের বলে যে তারা যেন ঘরের মধ্যে থাকে, বাইরে না বেরোয়। গ্রামবাসীদের বয়ান অনুসারে এই তিনদিন সুরক্ষা-বাহিনীর জোর কাজকর্মের মধ্যে কখনো কোনও ঘোষণা শোনা যায় নি, পুলিশ কিষানজিকে আত্মসমর্পণ করতে বলার ঘোষণার কথা তো নয়ই। ২৪ তারিখে বিকেল ৪-৫টার সময় খুব গন্ডগোলের আওয়াজ শোনা যায়, তার পর ১৫-৩০ মিনিট ধরে গুলির আওয়াজ শোনা যায়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে, গ্রামের হাতুড়ে ডাক্তার ভূদেব মাহাত ও ২০ বছর বয়সের ছাত্র তারাচাঁদ টুডু, গ্রামের এই দুজনকে ধরা হয় এবং তাদের একই কেস (নং ৪৬/১১, তাং ২৫/১১/২০১১) দেওয়া হয়, ভারতীয় দণ্ড-বিধির ৩০৭ এবং অন্যান্য ধারায় তাদের অভিযুক্ত করা হয়।

বুড়িশোল থেকে ৫ কিমি দূরে গোসাইবাঁধে পুলিশ স্থানীয় কলেজের থার্ড ইয়ার ভূগোলের ছাত্র ধর্মেন্দ্রকে জিজ্ঞাসাবাদের

জন্য আটক করেছে। পুলিশের অভিযোগ, তার কাছ থেকে একটি ল্যাপটপ পাওয়া গেছে। ধর্মেন্দ্রর পরিবারের লোকেরা বলছে যে ব্যাগটি ধর্মেন্দ্রর কিন্তু তাতে কোনো ল্যাপটপ ছিল না, বরং ২০০০০ টাকা চুরি করা হয়েছে। বাড়ির লোকেদের রেশন কার্ড, সার্টিফিকেট, ওবিসি কার্ডও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

জামবনি থানা

টিমের সদস্যরা এখানে এসআই সব্যসাচী বোধকের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে সংঘর্ষের কথা তিনি কখন জানতে পারেন, কে তাঁকে জানান এবং কে এফআইআর লেখেন— কারণ জায়গাটা তাঁর এলাকার মধ্যে পড়ে। তাদের কথা অনুসারে, জঙ্গলমহলের অ্যাডিশনাল এসপি অলোকনাথ রাজোরির কাছ থেকে রাত ১০-৩০-এ তাঁরা খবরটা পান। অ্যাডিশনাল এসপি এফআইআর লেখেন। এটা লক্ষ্য করা দরকার যে অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডিএসপি সিবি-সিআইডি-র ওপর, যেখানে অভিযোক্তা তাঁর চেয়ে উচ্চপদস্থ এক অফিসার। ন্যায়বিচারের মৌলিক নীতি যাতে বলা হয় যে অভিযোক্তার চেয়ে উচ্চতর পদের কোনো অফিসার অপরাধের বিচার করবেন— সেই নীতি এতে লঙ্ঘিত হচ্ছে।

কিষানজির দেহের ক্ষতগুলির ধরন মনে করাতে চাই। বুলেটের ক্ষত, পরিষ্কার কাটার চিহ্ন এবং পোড়ার দাগ। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সেই সেই জায়গার শার্ট-প্যান্টে কিন্তু একইরকম ক্ষতচিহ্ন নেই।

১) মাথার ক্ষত:
 ডানদিকের চোখটা বেরিয়ে এসেছে।
 ডান দিকের চোয়াল নেই, সেখানে পোড়ার চিহ্ন।
 মাথার পেছনের দিকে খুলি ও ঘিলু খানিকটা নেই।
 মুখের চার জায়গায় বেয়নেটের মতো আঘাতের চিহ্ন।
 গলার এক-তৃতীয়াংশে ছুরিকাঘাতের মতো আঘাতের চিহ্ন।
২) ডান হাতের নিচের দিকের হাড় ভাঙা, কিন্তু তার বাইরে কোন আঘাতের চিহ্ন নেই।
৩) ডান হাতে তিনটি গুলির চিহ্ন।
২) দুদিকের পায়ের গোড়ালিই (ankles) ভাঙ্গা। বাঁ পা-টা প্রায় ঝুলছে।
৩) বাঁ দিকের পায়ের তলার চামড়া নেই, পোড়ার চিহ্ন আছে।
৪) বাঁ হাতের তর্জনীর এক-তৃতীয়াংশ নেই।
৫) দেহের সামনের দিকে ৩০টির বেশি বেয়নেটের মতো কাটার চিহ্ন।

আমরা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে ইনকোয়েস্টের রিপোর্ট যোগাড় করতে পারিনি, পোস্ট মর্টেম রিপোর্টও পাই নি, যদিও টিম সদস্যরা সেটা পড়েছেন, তার থেকে নোট নিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় যে বুলেট ঢোকার ও বেরোনোর চিহ্ন বাদ দিলে উপরে বর্ণিত এই সমস্ত আঘাতের চিহ্নগুলির কোনোটারই উল্লেখ নেই সেখানে।

আমাদের মন্তব্য

দেহটি যেরকম ক্ষতবিক্ষত অথচ দেহের চারপাশ অক্ষত তাতে সরকারি বয়ান নিয়ে আমাদের সন্দেহ জেগেছে। ঐ সরকারি বয়ানের মধ্যেও আবার নানান অসংগতি রয়েছে। যেমন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী দাবি করেছেন যে তিন দিন ধরে কিষানজি ও তাঁর সঙ্গীদের ঘিরে রাখা হয়েছিল, তাঁদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন যে তাঁরা মাইকে কোনোরকম ঘোষণা শোনেননি, কিষানজিকে আত্মসমর্পণের জন্য ঘোষণা তো দূরের কথা। সিআরপিএফ-এর শ্রী বিজয় কুমার ২৫ তারিখে জানিয়েছেন যে কিষানজি ও অন্য তিনজন সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন, কিন্তু দেহ পাওয়া গেল মাত্র একটি। ১৫-৩০ মিনিট ধরে সংঘর্ষে শয়ে শয়ে গুলি চললো, কিন্তু যেখানে কিষানজির দেহ পাওয়া গেল সেখানে এই শয়ে শয়ে রাউন্ড গুলিবর্ষণের চিহ্ন মিলছে না।

কিষানজির হত্যার ঘটনাটি ঘটলো ঠিক তখনই যখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ও সিপিআই(মাওবাদী)-দের মধ্যে আলাপ-আলোচনার প্রচেষ্টা দুর্বলতর হচ্ছিল। কিষানজির মৃত্যুর সাথে সাথে এই প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটে গেল। আমরা এ কথা না ভেবে পারছি না যে গত বছরের জুলাই মাসের ১-২ তারিখে যখন চেরুকুরি রাজকুমার ওরফে আজাদকে একটি ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যা করা হয়েছিল সেরকমটাই আবার ঘটলো না তো?

আমরা মনে করাতে চাই যে কোনো এলাকায় কোনো সশস্ত্র সংঘর্ষের ঘটনায় কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে সেখানে প্রশাসনের এক শাখার কাজের তদন্ত যদি প্রশাসনেরই আর এক শাখা করে, তাকে নিরপেক্ষ ন্যায় তদন্ত বলা চলে না। আমাদের বিশ্বাস যে একমাত্র নিরপেক্ষ তদন্তই (যেমন SIT-র তদন্ত) সত্য উদঘাটনে সাহায্য করতে পারে।

এখানে বন্দী হত্যার ঘটনা হয়ে থাকতে পারে বলে আমাদের সন্দেহ দৃঢ়তর হচ্ছে। সেজন্য, আমাদের দাবি:

১। সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের কোনো কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত নিরপেক্ষ বিচারকের নেতৃত্বে কিষানজির মৃত্যুসম্পর্কিত ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত হোক।

২। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ নং ধারায় একটি ফৌজদারি কেস দায়ের করা হোক।

দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরি (সাধারণ সম্পাদক, এপিডিআর)
সি এইচ চন্দ্রশেখর (সাধারণ সম্পাদক, এপিসিএলসি)
ভানু সরকার (সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, বন্দী মুক্তি কমিটি)
গৌতম নাভলাখা (সদস্য, পিইউডিআর)

২ ডিসেম্বর ২০১১

কিষেনজি-র মৃত্যু-রহস্য!

ট্রেভর সেভ্ল্যাম

যৌথ বাহিনীর গুলিতে কিষেনজি-র মৃত্যুর দু'দিন পরে সিএনএন-আইবিএন তাদের এক সাংবাদিকের সাথে সিপিআই (মাওবাদী) দলের সমর্থক কবি ভরভরা রাও-এর একটি সাক্ষাৎকারের সরাসরি সম্প্রচার প্রচার করেছিল। সেদিনই ইউ-টিউবে সেটি পুনঃপ্রচারিত হয়েছিল। কার অদৃশ্য হাতের খেলায় জানি না, পরদিন থেকে কোনোরকম ব্যাখ্যা না দিয়েই হঠাৎ সেটি অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কী ছিল সেই সাক্ষাৎকারে, যা সেটিকে 'অজানা' সেই অদৃশ্য শক্তির কাছে অ-প্রচারযোগ্য করে তুলেছে? ভরভরা সেই সাক্ষাৎকারে স্পষ্টভাষায় দাবি করেছিলেন যে, যে কোনো 'এনকাউন্টার ডেথ'-এর ক্ষেত্রে (প্রকৃত বা ভুয়া যা-ই হোক না কেন), যথাযথ রীতিনীতি মেনে মৃতদেহের পোস্ট-মর্টেম করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের যে নির্দেশ আছে, সেটা মান্য করা হয় নি।

আর সরকারিভাবে মেদিনীপুরে করাপোস্ট-মর্টেম রিপোর্টে ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে, মৃত্যু ঘটেছে যে বন্দুকের গুলিতে, তা অন্তত '৫০০ মিটার' দূরত্ব থেকে ছোঁড়া হয়েছে। এবং এখানেই প্রশ্ন উঠেছে : কোন্ ব্যালিস্টিক তত্ত্বের ভিত্তিতে সরকারি 'বিশেষজ্ঞরা' এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোলেন? ভারতে এই ধরনের সামরিক বা আধা-সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে প্রধানত ব্যবহৃত হয় ইনসাস রাইফেল, এবং সেই বন্দুকের সর্বাধিক সম্ভাব্য দূরত্ব ৪৫০ মিটার (দ্রষ্টব্য: http://en.wikipedia.org/wiki/INSAS_rifle)। ভারতে ব্যবহৃত কোনো ধরনের ইনসাস রাইফেলই ৪৫০ মিটারের বেশি দূরত্বে মৃত্যু ঘটাবার মতো কার্যকর থাকে না। তাহলে?

তাহলে কি এ কে-৪৭ রাইফেল ব্যবহৃত হয়েছিল? মুস্কিল হচ্ছে, সেক্ষেত্রেও, সেটি সেমি-অটোমেটিক হলে তার সর্বাধিক সম্ভাব্য কার্যকর দূরত্ব ৪০০ মিটার (৪৪০ গজ), আর অটোমেটিক হলে তা ৩০০ মিটার বা ৩৩০ গজ। (দ্রষ্টব্য: http://en.wikipedia.org/wiki/AK-47)। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও বিজ্ঞান দিয়ে পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টের যথার্থতা প্রমাণিত হচ্ছে না।

তাছাড়া কিষেনজি-র মাথার ঘিলু করোটি ভেদ করে গুলির আঘাতে বেরিয়ে পড়েছিল। ৫০০ মিটার দূর থেকে ছোঁড়া গুলিতে সেটা যদি সম্ভবই না হয়, তাহলে দূরত্ব সম্পর্কিত এই আজগুবি কাহিনীটি পোস্ট-মর্টেমকারী ডাক্তাররা রচনা করলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর কিন্তু মিলছে না।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনার দু'দিন পরে মুখ খুললেন, বক্তৃতা দিতে গিয়ে তাঁর স্বভাবোচিত নিজস্ব নাটকীয় ভঙ্গিতে জানালেন: রক্তপাত এড়ানোর জন্য মাইকে ১০০ ঘন্টা ধরে কিষেনজি ও মাওবাদীদের আত্মসমর্পণ করার জন্য আবেদন জানাবার পরই কেবল গুলিবর্ষণ শুরু হয়েছিল; ফলে অন্তত ৫০০ মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর এই বিবরণীতে এমনকি পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর প্রধানরা পর্যন্ত একটু অসুবিধায় পড়ে গেলেন, কেননা মমতা মুখ খোলার আগেই তাঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে, দুপুর একটার সময় মাওবাদীদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়েছিল এবং সেদিনই বিকেল চারটের সময় কিষেনজি নিহত হয়েছিলেন। আর সবচেয়ে বড়ো কথা ১০০ ঘন্টা ধরে মাইকে প্রচার চললেও কেউ তার সামান্য আওয়াজ পর্যন্ত শুনতে পায় নি!

আবার যৌথ বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, সব মিলিয়ে তারা ঘটনার দিন মোট ৮০০ রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল, এবং জবাবে মাওবাদীরা চালিয়েছিল ৮০০ রাউন্ড। অর্থাৎ সব মিলিয়ে মোট ১৭০০ রাউন্ড গুলি সেদিন চলেছিল। অথচ, সংবাদপত্রের রিপোর্ট, সিআইডি সেখানে ৭০০টির বেশি গুলির চিহ্ন পায় নি। তাহলে?

অবশ্য মাওবাদীদের কাছ থেকেও অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নি। কিষেনজি-র মতো উচ্চ পর্যায়ের নেতার চারদিকে যে মাওবাদীদের যে প্রতিরক্ষা বলয় থাকার কথা, তার কোনো চিহ্ন মিললো না কেন? তিনি কি কোনো ফাঁদে পা দিয়েছিলেন? সরকারি তরফ থেকে অবশ্য তাঁর কমরেডদের 'বিশ্বাসঘাতকতা'র অনেক গল্প প্রচারিত হচ্ছে, কিন্তু সেটা তো হিটলারের প্রচার-সচিব গোয়েব্‌লসীয় পুরোনো কায়দা (দু'বছর আগে 'জনগণের কমিটি'-র নেতা ছত্রধর মাহাতোর ক্ষেত্রে যেমন কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির আজগুবি কাহিনী প্রচার করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন পুলিশ-প্রধান বশংবদ সংবাদমাধ্যমের সহযোগিতায়)। তবে এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ব্যাপক ব্যক্তিহত্যা ঘটাবার পরিণতিতে জনগণ থেকে মাওবাদীরা অনেকটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, মাটির সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা কমে গেছে। সম্ভবত নিজেদের স্কোয়াডের উপরেও আগের মতো তাদের আর নিয়ন্ত্রণ নেই।

www.countercurrents.org-এ প্রকাশিত ট্রেভর সেভ্ল্যাম-এর এই সংবাদ-প্রতিবেদনটি ঈষৎ সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত হলো

কিষেনজির মৃত্যু: মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে

সারা ভারতের শুধু নয়, আন্তর্জাতিকভাবেও গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার সংগঠনগুলি মাওবাদী নেতা কিষেনজির মৃত্যু সম্পর্কে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি তুলেছে। তাছাড়া তারা আরও দাবি করেছে যে, ভারতের আইন অনুসারে গঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রাসঙ্গিক বিধিও মান্য করা হোক। উল্লেখ্য যে, এই কমিশনের, এবং ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রিম কোর্টের সুস্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে: যে কোনো এনকাউন্টার মৃত্যুর ক্ষেত্রে (যথার্থ বা ভুয়া যাই হোক না কেন), মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে খুনের মামলা রুজু করতে হবে, এবং যারা মৃত্যু ঘটিয়েছে, তাদেরই উপর দায়িত্ব বর্তাবে তারা যে নির্দোষ, তা প্রমাণ করার। এখনও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই বিধিনির্দেশ অনুসারে ব্যবস্থা নেয় নি। রাজ্যস্তরে সিআইডি তদন্তের যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সেই সিআইডি-র বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন হবার আগে বর্তমান প্রধান শাসক দলই কিন্তু বার বার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে সিআইবি তদন্তের দাবি তুলেছে, কিন্তু অন্য অনেক কিছুর মতো এক্ষেত্রেও তারা ক্ষমতাচ্যুত বামফ্রন্ট সরকারের মতোই আচরণ করছে।

আর বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবির বিরুদ্ধে যথারীতি প্রশ্ন তুলছেন সামরিক অফিসাররা ও সরকারি বা শাসকদলীয় প্রধানরা, এবং তাদের মদত দিচ্ছে বশংবদ সংবাদ-মাধ্যমগুলি। তাদের বক্তব্য : মাওবাদীদের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কিংবা পুলিশ বা সামরিক বাহিনীর লোকেদের সংঘর্ষে মৃত্যুর ক্ষেত্রে এই সব সংগঠন তো মুখ খোলে না! স্পষ্টভাবে এই প্রশ্নের মোকাবিলা করা দরকার।

প্রথমত, মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে প্রাথমিক ধারণাই হচ্ছে এটা যে, রাষ্ট্র সন্ত্রাসের মূল উৎস। ভারত যে সনদের অন্যতম স্বাক্ষরদাতা সেই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের অন্তর্নিহিত মূল সূচনাবিন্দুও সেটাই। তাই ন্যূনতম মানবাধিকার-সচেতন প্রত্যেক মানুষেরই প্রাথমিক দায়িত্ব সেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরোধিতা করা।

দ্বিতীয়ত, কিন্তু তাই বলে অ-রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সম্পর্কে কি মানবাধিকার-সচেতন মানুষ নীরব থাকবেন? এই প্রশ্নটি নিয়ে আমাদের দেশে মানবাধিকার সংগঠনগুলির মধ্যে পর্যন্ত দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলেছে। এই মুহূর্তে ভারতের প্রাচীনতম মানবাধিকার সংগঠন এই রাজ্যেরই এপিডিআর সংস্থা শুরু থেকেই (১৯৭২) এই প্রশ্নে নকশালপন্থী-মাওবাদী-সহ সমস্ত অ-রাষ্ট্রীয় সংগঠন-গুলির 'অযৌক্তিক, নির্বিচার ও পরিহারযোগ্য' হত্যাকাণ্ডগুলির নিন্দা করার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে আসছে; বস্তুত তাদের সংবিধানে পর্যন্ত সেকথা লিখিতভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক দীর্ঘ বিতর্কের পর এই মুহূর্তে এপিডিআর, পিইউডিআর, পিইউসিএল, এপিসিএলসি প্রভৃতি ভারতের প্রতিটি সক্রিয় ও অগ্রণী মানবাধিকার সংগঠনই এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করছে। অথচ সরকারি বশংবদ কিংবা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সচেতন বা অচেতন সমর্থকরা যথারীতি তারস্বরে তাদের মিথ্যে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

তৃতীয়ত, সবচেয়ে জঘন্য হচ্ছে এটাই যে, মানবাধিকার সংগঠনগুলি উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে অ-রাষ্ট্রীয় সংগঠন-গুলির 'অযৌক্তিক, নির্বিচার ও পরিহারযোগ্য' হত্যাকাণ্ডগুলির নিন্দা করে সংবাদ-মাধ্যমে লিখিত বিবৃতি পাঠালেও অধিকাংশই সেগুলি প্রকাশ করা প্রয়োজন মনে করে না, অথচ তা চেপে গিয়ে কোনো ঘটনা ঘটলেই প্রশ্ন তোলে: কেন সেগুলির নিন্দা করা হচ্ছে না! একটু দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। পশ্চিমবঙ্গে মমতা সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুসারে মোটামুটি ৮০টি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে; তার মধ্যে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে ৮টি হত্যাকাণ্ড ঘটাবার অভিযোগ উঠেছে, বাকিগুলির অধিকাংশের জন্য অভিযুক্ত শাসক তৃণমূল দল। তথ্য দিয়ে প্রমাণ করা যায়: এপিডিআর মাওবাদীদের ৮টির মধ্যে ৪টির বিরুদ্ধে এবং বাকি ৭২টির মধ্যে ২টির বিরুদ্ধে নিন্দাপ্রকাশ করেছে। তথ্যের ভিত্তিতে তো বরং তাহলে এপিডিআর-এর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলা উচিত যে, তারা কেন শাসক দলের বিরুদ্ধে নীরব থাকছে! সেই অভিযোগ তো শাসকশ্রেণীর তাঁবেদাররা তুলছেন না!

প্রবীণ রায়
মানবাধিকার কর্মী

হাসপাতালে বীভৎস মৃত্যু

গত ৯ ডিসেম্বর কলকাতায় ঢাকুরিয়ার 'আমরি' হাসপাতালে আগুন লাগার ফলে বীভৎসভাবে যে প্রায় একশো জন রোগী-নার্স প্রভৃতির মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের পরিবারকে *অনীক* গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে যাদের মুনাফার লালসা, বেনিয়ম ও চূড়ান্ত গাফিলতিতে এই বেনজির ঘটনা ঘটেছে, তাদের সবার চরম শাস্তির দাবি জানাচ্ছে।

এই প্রসঙ্গেই *অনীক* প্রতিবাদ জানাচ্ছে বিশ্বায়ন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আমাদের দেশে 'দক্ষতা' সৃষ্টির অজুহাতে সমস্ত পরিষেবার ধারাবাহিক বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেও। এখনই তার বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারলে আরও অনেক সর্বনাশ কিন্তু ঘনিয়ে আসবে— আসবেই।

ঘটনা প্রবাহ

পরিবর্তন-এর জঙ্গলমহল: প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতা

'পরিবর্তন'-এর ঝড়ে সওয়ার হয়ে শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জী রাইটার্সে আসীন হওয়ার পর ছ মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ বামফ্রন্ট সরকারকে গদিচ্যুত করতে কতটা মরিয়া ছিল তা বোঝা যায় পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনী-পুরের জঙ্গলমহলে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী সাফল্যে। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ ছাড়া সমস্ত উল্লেখযোগ্য নেতা-মন্ত্রীই ওই অঞ্চলে গত বিধানসভা নির্বাচনে ধরাশায়ী হয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে এই অঞ্চলের জনগণের এ হেন ক্ষোভের কারণ নিয়ে অনীক-এর পাতায় অনতি অতীতে অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

নিঃসন্দেহে সেই ক্ষোভের অন্যতম কারণ ছিল সমস্ত জঙ্গলমহল জুড়ে দখলদার বাহিনীর কায়দায় যৌথ বাহিনীর অত্যাচার, নির্বিচার গ্রেপ্তার। গ্রেপ্তার হয়েছেন 'পুলিশী সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি-র বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মী। বামফ্রন্ট সরকার এদের গ্রেপ্তার করেছিল ইউএপিএ আইনে। এছাড়াও জঙ্গলমহলের সেই সময়কার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বহু মানুষ— যাদের মধ্যে আছে মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা— নির্বিচার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ঐ একই আইনে। গ্রেপ্তারের তালিকায় আরও ছিলেন ঘোষিত মাওবাদী নেতা-কর্মীরা।

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তৎকালীন বিরোধী নেত্রী জঙ্গলমহলের এই পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে ভোটের বাক্সে বন্দী করার জন্য দাবি তুলেছিলেন 'যৌথ বাহিনী' প্রত্যাহারের ও সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল মাওবাদীদের সাথে আলোচনার সিদ্ধান্ত। সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের হাতে জমি ফিরিয়ে দেবার প্রকল্প অগ্রাধিকারের তালিকায় যদি প্রথম হয় তবে দ্বিতীয়টি অবশ্যই ছিল জঙ্গলমহল থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি। শহরের মানুষ ও নাগরিক সমাজের একাংশ যারা সাম্প্রতিক কালের 'বামফ্রন্টীয় বামপন্থায়' বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা অনেকে ভাবতে শুরু করেছিলেন হয়ত ১৯৭৭ পরবর্তী বন্দীমুক্তি সংক্রান্ত প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পরেই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক বন্দী সম্পর্কিত কমিটি তৈরি করেন ও তার কাজের 'টার্মস অফ রেফারেন্স ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা থেকেই, বিশেষত 'কেস বাই কেস' বিবেচনার মাপকাঠি থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি বিশেষত জঙ্গলমহল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ধৃত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি বিশ বাঁও জলে। সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক চাষিরা তাঁদের জমির জন্য ২০০৬-এর ডিসেম্বর থেকে অপেক্ষা করছেন। এখন হাইকোর্ট-সুপ্রিম কোর্ট হয়ে সিঙ্গুর মামলা নিষ্পত্তি হতে আরও কটা নির্বাচন পেরোবে তা ভবিষ্যতই বলবে। আর আমরা তো জানি স্মৃতির পরিণতি হয় বিস্মৃতির অতলে।

রাজনৈতিক বন্দীমুক্তির বিষয়ে একই কথা বলা যায়। প্রথম বামফ্রন্ট সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির কথা ঘোষণা করার পর অত্যন্ত দ্রুততায় প্রায় সমস্ত নকশালপন্থী বন্দী মুক্তি পান। মুক্তি পান সিপিএম-এর বহু কর্মী। এমনকি জরুরি অবস্থার সময় ধৃত কিছু সমাজবিরোধীও মুক্তি পেয়ে যায়। কিন্তু এখন, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর, ঘোষিত মাওবাদীদের কথা না হয় বাদই দিলাম তর্কের খাতিরে- ছত্রধর মাহাতো (যিনি গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন) সহ জঙ্গলমহল আন্দোলনের একজন নেতা বা কর্মীও আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে নিঃশর্ত মুক্তি পান নি। মুক্তি পাননি ঐ আন্দোলনে অংশ নেওয়ার কারণে ধৃত সাধারণ মানুষের একজনও। বরং নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর আরও মানুষকে জঙ্গলমহল আন্দোলনে অংশ নেবার কারণে ধরা হয়েছে। সুতরাং রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির বিষয়ে সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তোলা আশা করি অন্যায় হবে না।

বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী জানেন 'আমি তোমাদেরই লোক' থাকতে গেলে কী করতে হয়, প্রাসঙ্গিক থাকতে গেলে, নজর কাড়তে গেলে কী করতে হয়। মহাকরণ যাওয়ার পথে শহরের কোনো হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে পড়লে যে জনস্বাস্থ্য বা সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল ফেরে না (ধুলো ঝাড়পোঁছ বা পরবর্তী কয়েকদিন ডাক্তারদের হাজিরার একটু উন্নতি হওয়া ছাড়া) তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই জানেন। বাজেটে কত টাকা ধার্য হলো, স্বল্পমেয়াদি-দীর্ঘমেয়াদি কী কী পরিকল্পনা নেওয়া হলো, তা রূপায়ণের কী পদক্ষেপ রাখা হবে সেগুলোই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও স্বাস্থ্য বিষয়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী (স্বাস্থ্য দপ্তর তাঁর অধীনেই আছে) ঘোষণা করেছেন যে তাঁরা প্রাইভেট-পাবলিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবেন। আর প্রাইভেট-পাবলিক অংশীদারিত্বের মূল কথা যে সরকারি বিনিয়োগ আর ব্যক্তিপুঁজির মুনাফা— এটা সবারই জানা। আর এটা যে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারেরই মডেল সেটা বলা নিষ্প্রয়োজন।

জঙ্গলমহল সম্পর্কে একটা কথা বারবার বলা হচ্ছে যে 'যৌথ বাহিনী' তোলা হবে কী করে, কারণ মাওবাদীরা সক্রিয়। যেন গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় মাওবাদীরা সক্রিয় ছিল না। বিগত বামফ্রন্ট সরকার চিদাম্বরমের পরামর্শে ও সহযোগিতায় যৌথবাহিনী নামানোর সময়ে একই যুক্তি দেখিয়েছিল। তাহলে পরিবর্তন কোথায়? তাছাড়া, ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে বিধানসভা নির্বচিন পর্যন্ত উত্তর

ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় সিপিএম-তৃণমূল সংঘর্ষে রাজনৈতিক হত্যার ঘটনা জঙ্গলমহলের তুলনায় কোনো অংশে কম নয়। সুতরাং মাওবাদীদের নির্বিচার রাজনৈতিক হত্যাকেও কারণ হিসাবে দেখানো যায় না। তবে অজুহাত হিসাবে অবশ্যই দেখানো যায়। উত্তর বা দক্ষিণ ২৪ পরগণায় তো যৌথ বাহিনী নামানো হচ্ছে না।

বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী যে সময়টায় বলা হচ্ছে যৌথ বাহিনী নিষ্ক্রিয় ছিল সে সময় আসলে সক্রিয় ছিল 'ভৈরব বাহিনী'। যা আসলে রং পাল্টানো হার্মাদ বাহিনী, যারা সিপিএমের বদলে তৃণমূলের বাহিনী। বাম জমানায় যেমন যৌথ বাহিনীকে সহায়তা করত হার্মাদ বাহিনী, তেমনই বর্তমান জমানায় যৌথ বাহিনীর প্রধান সহায়ক 'ভৈরব বাহিনী'। বাম আমলের মতোই বর্তমানে জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দল করা যাবে না— এটাই অনুচ্চারিত হুকুম। এমন কি নারী ইজ্জত বাঁচাও কমিটির মতো মহিলা সংগঠনও প্রকাশ্য কার্যক্রম থেকে বঞ্চিত। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার শ্রীমতি মমতা ব্যানার্জির গত ১৫ অক্টোবর ঝাড়গ্রামে সভা করেন। এই সভার অব্যবহিত পূর্বে বেলপাহাড়ি ব্লকের কাকড়াঝোড় এলাকা সুশ্নিজবি গ্রামে এক গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে যৌথবাহিনীর বিরুদ্ধে। যৌথবাহিনী এসেছিল তাঁর স্বামীকে গ্রেপ্তার করতে। এই ঘটনা নিয়ে সংবাদপত্রে কিছু সোরগোল হয়। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী, যিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও বটে, এই ঘটনা নিয়ে ঝাড়গ্রামের সভায় বা তার পরে একটিও শব্দ ব্যয় করেন নি। ঝাড়গ্রাম তো সিঙ্গুর বা নন্দীগ্রাম নয়। যদিও ঐ সভায় তিনি মাওবাদীদের 'সুপারি কিলার' বা 'জঙ্গল মাফিয়া' বলে অভিহিত করেন।

২০ মে বর্তমান সরকার শপথ নেবার পর সুবর্ণরেখা-ডুলুং দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। শালবনিতে জিন্দালদের থমকে থাকা সুবৃহৎ ইস্পাত প্রকল্পের কাজ শুরু হয়ে গেছে। যদিও এক্ষেত্রে জমি কোন জটিলতা হবে না। আগের মতোই শাসক দল এই প্রকল্পের পক্ষে— এটা বুঝিয়ে দেওয়া গেছে। আমাদের রাজ্যের প্রত্যন্ত এই পশ্চিমাঞ্চলকে জুড়ে ফেলার জন্য রাস্তা তৈরির প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী বাম সরকার জনমতের চাপে আর স্পঞ্জ আয়রন কারখানা বানানোর অনুমতি দেবেন না বলে ঘোষণা করেছিলেন। শোনা যাচ্ছে, ঝাড়গ্রামের কাছে রাজ্যের বৃহত্তম স্পঞ্জ কারখানার ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। ছত্তিশগড়ের কায়দায় জঙ্গলমহলে ১০,০০০ স্পেশাল পুলিশ হাবিলদার নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় যুবকরা বিশেষত আদিবাসীরা এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। একজন স্থায়ী পুলিশ কর্মী নিয়োগের মাসিক খরচ যদি হয় ২০,০০০ টাকা, তবে তার অর্ধেকেরও কম টাকায় এই স্পেশাল পুলিশ হাবিলদারদের নিয়োগ করা হবে। ব্যয় সংকোচনের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বটে! একথা সবাই জানেন যে সরকারি ঘোষণা ও বাস্তবের মধ্যে তফাত অনেকখানি। তবুও এই ঘোষণা বেকার যুবকদের আকৃষ্ট করাই স্বাভাবিক। এটা আরও বাস্তব যখন জঙ্গলমহলের আন্দোলন অনেক জটিলতার কারণে এক দিশাহারা অবস্থার মধ্যে পড়েছে। এটা 'আশা' করা যায় যে কিছুদিনের মধ্যে শালবনিতে জিন্দালদের বৃহত্তম (ঘোষণা অনুযায়ী) ইস্পাত প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। আর সে কাজের জন্য, বিশেষত মাটি কাটা-সমতল করা-নির্মাণ কাজের জন্য লাগবে মজুর। অন্যান্য টুকিটাকি কাজের জন্য দরকার হবে প্রচুর অসংগঠিত শ্রমিক। সুতরাং পিচ রাস্তা দিয়ে যুক্ত জঙ্গলের প্রত্যন্ত গ্রামগুলো থেকে দল বেঁধে আদিবাসীরা যারা 'গ্রামীণ বেকার সর্বহারা বাহিনী'র অংশ তারা আসতে শুরু করবেন ঠিকা শ্রমিক হিসেবে। সুতরাং আপাতত জঙ্গলমহলের উন্নয়ন = পিচ রাস্তা নির্মাণ।

শ্যামল দাস

এপিডিআর-মেট্রো চ্যানেল বিতর্ক : ঘটনা-পরম্পরা

১। নভেম্বর ৪ তারিখে এপিডিআর-কর্মীরা লালবাজারে ২৩, ২৪ ও ২৫ নভেম্বর মেট্রো চ্যানেলে সভা করার অনুমতি চেয়ে আবেদন জমা দিতে যান।— ভারপ্রাপ্ত অফিসার জানান, ২৫ তারিখে অন্যদের সভা আছে, তাই প্রথম দু'দিন, অর্থাৎ ২৩ ও ২৪ তারিখে মেট্রো চ্যানেল পাওয়া যাবে। এপিডিআর-কর্মীরা সম্মতি জানান। সেই অনুসারে অফিসারটি তাদের সেই আবেদনপত্রটিকে 'সংশোধন' করে নিজের হাতে "২৩ ও ২৪ নভেম্বর" লিখে দেন।

—পরবর্তীতে এপিডিআর-এর পক্ষ থেকে বার বার প্রকাশ্যে সেই মূল আবেদনপত্রটিকে প্রকাশ করার জন্য চ্যালেঞ্জ জানানো হয়, যাতে প্রকৃত ঘটনা কী সেটা প্রমাণিত হয়।

—আজ পর্যন্ত পুলিশ বা প্রশাসন সেই চ্যালেঞ্জের উত্তরে সেটা প্রকাশ্যে আনে নি!

২। নভেম্বর ১৭ তারিখে লালবাজার থেকে এপিডিআর-কে চিঠি দিয়ে জানানো যে, ওই দু'দিন মেট্রো চ্যানেলে এপিডিআর-কে সভা করার অনুমতি দেওয়া যাচ্ছে না। *উল্লেখ্য যে*, ওই চিঠিতে বা পরবর্তীকালে লিখিতভাবে বিকল্প কোনো স্থানে ওই সভা করার কোনো প্রস্তাব লালবাজারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় নি।

—বরং এপিডিআর-কে ওই চিঠিতে অনুরোধ জানানো হয় —(*অনুগ্রহ করে খেয়াল করুন!*)—তাদের ওই সভা বাতিল (*requested to cancel their programme*) করার জন্য।

স্বভাবতই প্রশ্ন তুলতে হয় : সভা 'বাতিল করার অনুরোধ' জানানোর সাথে বিকল্প জায়গার প্রস্তাব দেওয়াটা কি সঙ্গতিপূর্ণ —যেটা দেওয়া হয়েছিল বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এপিডিআর-এর প্রেস-কনফারেন্সের পর দাবি করেছিলেন?

—এপিডিআর-ই বরং লালবাজারের সেই চিঠিটি প্রকাশ

করে দিয়েছে। সেটি জাল এমন দাবি আজ পর্যন্ত পুলিশ বা মুখ্যমন্ত্রীও করেন নি!

৩। সেদিনই, অর্থাৎ ১৭ তারিখেই সভা বাতিল করার সেই পুলিশি 'অনুরোধ' পাবার সাথে সাথেই, লালবাজারকে কিছু না জানিয়েই, এপিডিআর মুচিপাড়া থানায় চিঠি দিয়ে ওই দু'দিন বউবাজারে ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার সামনে সভা করার অনুমতি চায়। রুটিনমতোই থানা অনুমতি দেয়।

—উল্লেখ্য যে, বিকল্প স্থানে সভা করার সেই উদ্যোগের কথা সেদিনই লালবাজারে পৌঁছেছিল কিনা, এপিডিআর-এর স্বভাবতই তা জানা ছিল না।

৪। ১৮ তারিখে এপিডিআর-কর্মীরা লালবাজারে গিয়ে (৪ তারিখের পর এই প্রথম) ২৩-২৪ তারিখে মেট্রো চ্যানেলে সভা করতে দেবার জন্য পুলিশকে আর একবার অনুরোধ জানান। তাঁরা আরও জানতে চান, সেখানে অনুমতি দিয়েও পরে তা বাতিল করাটা উপরের নির্দেশে হয়েছে কিনা। ভারপ্রাপ্ত অফিসার সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে বলেন: আমাকে যা খুশি বলুন, কিন্তু আপনাদের কোনো প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারবো না।

—*স্বভাবতই এই কথাবার্তার টেপ-করা বা অন্য কোনো রকমের প্রমাণ এপিডিআর-কর্মীদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়!*

৫। এরপর এপিডিআর সিদ্ধান্ত নেয়, সমস্ত ঘটনার বিবরণ সুধীজনের কাছে তুলে ধরা হবে। কর্মীরা কোনো বিবৃতি তৈরি করে তাতে তাঁদের স্বাক্ষর না করিয়ে তাঁদেরকে নিজেদের প্রতিক্রিয়া লিখে দেবার জন্য অনুরোধ জানান। অনেকেই লিখে দেন, কেউ কেউ এসএমএস করেও নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানান। প্রায় সবার (যেমন মহাশ্বেতা দেবী, শঙ্খ ঘোষ, তরুণ সান্যাল, বিভাস চক্রবর্তী, নবারুণ ভট্টাচার্য, দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, সব্যসাচী দেব, প্রতুল মুখোপাধ্যায়, সুমন মুখোপাধ্যায়, অনুশ্রী-বিপুল চক্রবর্তী) সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। কেউ কেউ (অপর্ণা সেন, কৌশিক সেন, সুচিত্রা ভট্টাচার্য) এমনকি এপিডিআর-এর যৌথ বাহিনী প্রত্যাহার বা সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিকে সমর্থন না করা সত্ত্বেও, তাদেরকে মেট্রো চ্যানেলে সভা করতে অনুমতি না দেবার কারণে প্রতিবাদ জানান।

৬। এপিডিআর এর পর ২১ নভেম্বর প্রেস-কনফারেন্স ডেকে সেখানে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করার এবং সুধীজনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়।

সেই প্রেস-কনফারেন্সে মহাশ্বেতা দেবী, জয়া মিত্র প্রভৃতিরাও উপস্থিত ছিলেন। এর কয়েকদিন আগেই মহাশ্বেতা দেবী জঙ্গলমহলে সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত শবর মেলায় গিয়েছিলেন, এবং সেখানে সমবেত মানুষদের কাছে তাদের উপর যৌথ বাহিনীর ধারাবাহিক অত্যাচারের বিবরণ শুনে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। প্রেস-কনফারেন্সে একশ্রেণীর সাংবাদিকদের ক্রমাগত প্রশ্নের মুখে তিনি প্রশ্ন তোলেন: আমরা কি ফ্যাসিবাদকে ডেকে আনলাম? সে খবর মহাকরণে পৌঁছোতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তড়িঘড়ি সাংবাদিকদের ডেকে কিছুদিন আগেও তাঁদেরই বর্ণনামতো 'মানুষের বিবেক' হিসেবে অভিহিত মহাশ্বেতা দেবীও প্রতিবাদী সুধীজনদের তথ্যবিকৃতি-সহযোগে আক্রমণ করেন।

—*এর পরের ঘটনাবলী তো এখন ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে!*

প্রতিবেদক

আবার ভোপাল

ডিসেম্বর মাস এলেই ১৯৮৪ সালের ডিসেম্বর ২-৩-এর রাতভোরে সেই ভয়াবহ 'গ্যাস দুর্ঘটনা'-র কথা স্মরণে আসে। বহুজাতিক সংস্থার অপ্রমাণিত প্রযুক্তি, তামাদি হয়ে যাওয়া যন্ত্র, অকেজো ওষুধ ইত্যাদির বোঝা ভারত সহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে চালান করার ভয়াবহ পরিণাম ভোপালের গ্যাসপীড়িত মানুষেরা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছেন।

গ্যাসপীড়িতদের চিকিৎসার জন্য সরিয়ে রাখা টাকায় ভোপাল শহরের সৌন্দর্যায়ন হয়েছে, তাঁদের জন্য তৈরি হাসপাতালে তাঁরা চিকিৎসা পান না। চিকিৎসার অভাব ও কুচিকিৎসার ফলে সপ্তাহে দুজন করে গ্যাসপীড়িত মানুষ প্রয়াত হচ্ছেন, সম্পূর্ণ পরিহার্য এই মৃত্যুর ফলে কিন্তু ভোপালের গ্যাসপীড়িতদের জন্য নির্মিত বেসরকারি ট্রাস্ট দ্বারা পরিচালিত চিকিৎসাকেন্দ্র ভোপাল মেমোরিয়াল হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার মুনাফা লুঠছে। ঘটনাটি অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি।

২০১১ সালের ১৪ নভেম্বর এই হাসপাতালে কয়েকজন গ্যাসপীড়িত সন্দেহজনকভাবে প্রয়াত হলে জানা যায় যে কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থার অপ্রমাণিত কয়েকটি সংক্রমণ নিরোধক ওষুধ তাঁদের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছিল রোগীদের লিখিত অনুমতি ছাড়াই, তাদের অজান্তেই। ভারতের ড্রাগ কন্ট্রোলার এই নিয়ে তদন্ত শুরু করলে আরও সব চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসে।

জানা গেছে, গত দু বছর ধরে এই হাসপাতালটি গ্যাসপীড়িতদের ওপর অপ্রমাণিত ওষুধের পরীক্ষামূলক প্রয়োগের বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ। এই বাবদ তারা একটি ব্রিটিশ কোম্পানি থেকে ১ কোটি টাকা এবং ফরাসি ও মার্কিন কোম্পানিগুলির কাছ থেকে আরও ১০ কোটি টাকা পেয়েছে। হাসপাতালটি প্রতি তিন মাসে ঐ ওষুধ সংস্থাগুলিকে কেবল 'গবেষণার জন্য রোগী' সরবরাহ খাতেই ৬২ লক্ষ টাকা মুনাফা করেছে!

যে 'পরীক্ষাটি' নিয়ে পুরো কেলেঙ্কারিটি সামনে এলো ভোপালের ঐ হাসপাতালটিতে সেটি চালাচ্ছিল বহুজাতিক ওষুধ সংস্থা ফাইজার-এর হয়ে তাদেরই অধীনস্থ সংস্থা থেরাভেন্স, সানোফি এবং হুইথ সংস্থা। এই সংস্থাগুলি যে ৩৪ জন গ্যাসপীড়িতর ওপর একটি 'সংক্রমণ-নিরোধক' 'পরীক্ষামূলক

ওষুধ' প্রয়োগ করেছিল, তাঁদের মধ্যে ৩২ জনই এই ওষুধ সেবনের ৮ থেকে ১২ ঘন্টার মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। কোনো বাইরের বিশেষজ্ঞের সার্টিফিকেট ছাড়াই (যা কিনা ভারতীয় আইনমতে বাধ্যতামূলক) এই মৃত্যুগুলিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ 'প্রযুক্ত ওষুধের সঙ্গে সম্পর্কহীন মৃত্যু' বলে সার্টিফিকেট দেয় এবং 'পরীক্ষার জন্য রোগী সরবরাহ' খাতে প্রায় দু লক্ষ টাকা পায়।

সারা ভারতে রোগীর অনুমতি না নিয়ে পরীক্ষামূলক ওষুধের প্রয়োগ হচ্ছে প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার রোগীর ওপর- এমন নীতিবিরুদ্ধ গর্হিত 'পরীক্ষা'র সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। জানুয়ারি ২০০৭ থেকে ২০১০-এর জুন পর্যন্ত এইসব 'পরীক্ষা'র ফলে প্রায় ১৮০০ জন প্রাণ হারিয়েছেন- কোর্ট কেসের ফলে তা প্রকাশ্যে এসেছে। এখনো পর্যন্ত কেউ ক্ষতিপূরণ পান নি।

স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ, যা কিনা এই রাজ্যে পরিবর্তনের প্রস্তাবিত মডেল, যা অনুযায়ী কাজ বিগত সরকারের আমল থেকেই শুরু হয়ে গেছে, সেখানে প্রাইভেট অনাচারের বিরুদ্ধে পাবলিক অ্যাকশনের স্থান সংকুচিত। তা সে ভোপালের পি-পি-পি হাসপাতালই হোক, বা সদ্য ঘটে যাওয়া ঢাকুরিয়ার আমরি হাসপাতাল নামক জতুগৃহই হোক। ভোপালের ঘটনা আবার দেখালো যে স্বাস্থ্য পরিষেবা একটি ব্যবসায় পরিণত হলে কেমনভাবে পাবলিকের ভাগ্যে জোটে অনাচার, মৃত্যু, স্বাস্থ্যহানি, প্রতারণা, আর প্রাইভেট লগ্নিকারীর জন্য থেকে যায় মুনাফা, মৃত্যুর কারবারের মুনাফা।

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

পঞ্চায়েতরাজঃ প্রতিনিধিত্বমূলক, না আমলাতান্ত্রিক?

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কার্যত একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের তৃণমূলস্তরের মানুষের আশা আকাঙ্খা, তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার আধার হল এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় যেমন মানুষের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয় তেমনি তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার স্বীকৃতি পায়। তাই এই ব্যবস্থা সঠিক আদর্শকে সামনে রেখে পরিচালিত হলে তা হয়ে ওঠে ভূমিস্তরে গণতন্ত্রের আধার। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া চালু রাখা সম্ভব সঠিক আদর্শে পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠা করে। শুধু পঞ্চায়েতরাজ চালু করলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না বা ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে না। অর্থাৎ পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজনীয় শর্ত হলেও যথেষ্ট শর্ত নয়। যথেষ্ট শর্ত হল জনগণের স্বার্থ বজায় রাখার আদর্শ বজায় রেখে পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠা করা। অন্যভাবে বলা যায় যে ভোটের ব্যবস্থা বজায় রেখে এক কাঠামোগত গণতন্ত্র বজায় রাখাই যথেষ্ট নয়, তাতেই আপনা থেকে বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে না। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ এবং তাদের উদ্যোগের দ্বার খুলে দিয়ে তাদের স্বার্থে পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই প্রকৃত অর্থে ক্ষমতার কার্যকর বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে। পঞ্চায়েতব্যবস্থা তৃণমূলস্তরে ক্ষমতায়নের আধার হয়ে উঠতে পারে।

প্রশ্ন হলো কোন প্রক্রিয়ায় পঞ্চায়েত নামক প্রতিষ্ঠানটি বাস্তবায়িত হওয়া উচিত? সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচনের মাধ্যমে, না মনোনয়ন পদ্ধতিতে আমলাতান্ত্রিক কায়দায় ওপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে? বামফ্রন্ট আমলে প্রথম পদ্ধতিটিই চলেছে, তবে জনগণের বদলে পার্টিতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সমস্ত প্রক্রিয়াটাকেই বিপথে চালিত করেছে। নতুন জমানায় আবার তা বন্ধ করার 'ওষুধ' হিসেবে বিডিও-র মতো আমলাদের হাতে বেশি ক্ষমতা দিয়ে অর্থাৎ জনগণের নির্বাচিত পঞ্চায়েতের হাত থেকে ক্ষমতা সরিয়ে এনে, তাকে শিখন্ডি করে আমলা মারফৎ পঞ্চায়েত পরিচালনা করার নিদান দেওয়া হচ্ছে। এযাবৎকালে পঞ্চায়েত শাসনে যে দুর্নীতির ও স্বজনপোষণের আখড়া গড়ে উঠেছে তার অজুহাতেই এই পরিবর্তনের পক্ষে ওকালতি করা হচ্ছে। আমরা প্রথমে বামফ্রন্টের আমলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা কীভাবে কী রূপ পেল এবং তা কেন কাঙ্খিত ফল দিতে পারল না তা দেখব। তারপর বিচার করব মমতা সরকার আমলাতন্ত্রের হাতে বেশি ক্ষমতা দিয়ে সত্যি কী করতে চান? এতে সত্যি কি সরকার কি সাধারণ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থাকবেন, না পঞ্চায়েতের আমলাতন্ত্রীকরণ ঘটিয়ে এর মাধ্যমে কর্পোরেট শাসনের পথ প্রশস্ত করবেন?

কেন্দ্রের পঞ্চায়েত আইন অনুসরণ করে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। গ্রাম স্তরে গ্রাম পঞ্চায়েত, কয়েকটা গ্রাম নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলাস্তরে জেলা পরিষদ। এই তিনটিই নির্বাচিত সংস্থা। যে দল বা দলীয় জোট সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা পরিচালনার ভার পায়। জেলা ধরে একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা তৈরি করে গ্রামপঞ্চায়েতের মাধ্যমে তা রূপায়িত হওয়ার বিধান থাকে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি রূপায়নেও তাদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করে। গ্রামগুলোর সমস্যা ও তা সমাধানের প্রয়োজন সম্পর্কে যে তথ্য তারা পায় তা জেলা পরিষদের কাছে পাঠায়। অর্থাৎ গ্রাম সমাজের তলা থেকে জেলাস্তর পর্যন্ত একটা উভয়মুখী সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ থাকে এই ব্যবস্থায়। বিডিও-অফিস খবরদারি নয়, নজরদারির কাজ করে। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের জন্য যে অর্থ আসে তা বিডিও-র মাধ্যমে গ্রাম স্তরে বন্টিত হয়। গ্রামস্তরে উন্নয়নের কাজে পঞ্চায়েতের সক্রিয় ভূমিকা এই ব্যবস্থায় স্বীকৃত।

এটা হলো পঞ্চায়েতরাজের আদর্শগত অবস্থা। একে বাস্তব রূপ দিতে গেলে পরিচালক দলটিকে আদর্শ জনস্বার্থ অভিমুখী হতে হয় যাকে আমরা সার্থকতার যথেষ্ট শর্ত বলেছি। দল বা সরকার, কারোর অযাচিত হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। সাধারণ মানুষের উদ্যোগের ওপর নির্ভর করে এই ব্যবস্থাকে পরিচালিত করতে হয়। তবে সাধারণ মানুষের স্বার্থে পরিচালিত হওয়ার পথে

বাধার সৃষ্টি হলে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। প্রয়োজনে প্রশাসনের সাহায্য নিতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ক্ষমতায় এসে অল্পদিনের মধ্যেই বামফ্রন্ট একদিকে ভূমিসংস্কার অন্যদিকে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করে। একে সর্বস্তরের মানুষ স্বাগত জানায়। বাম রাজনীতির এ এক বড় জয় বলে বিবেচিত হয়। এতে গ্রামীণ সমাজে গরিব মানুষের অধিকারের সঙ্গে ইজ্জত প্রতিষ্ঠিত হবে বলে ব্যাপক উৎসাহের সঞ্চার হয়। মানুষের এই প্রত্যাশার কারণ তৃণমূল স্তরে সিপিএমের শক্তপোক্ত সংগঠন ছিল যার দায়িত্বে ছিল পোড় খাওয়া নেতৃত্ব। আশা করা গিয়েছিল যে গ্রামে গণমুখী কাজে পঞ্চায়েতের সাহায্য নেওয়া হবে। পার্টি তার আদর্শের ভিত্তিতে সরকারকে পরিচালিত করবে। নীতির প্রশ্নে কায়েমি স্বার্থের সঙ্গে সমঝোতা করবে না, সাধারণ মানুষের স্বার্থের পাশে থাকবে। সুতরাং পঞ্চায়েত রাজ-এর সার্থকতার শর্ত পূর্ণ হবে।

বামফ্রন্ট আমলে প্রতি পাঁচবছর অন্তর সময়মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে আপাতদৃষ্টিতে একটা সুশৃঙ্খল পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু যত সময় যায় তত বোঝা যায় যে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ হলেও যথেষ্ট শর্ত পূরণ হয় না। ফলে কার্যত মানুষের আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয় না এই পঞ্চায়েত রাজে। এই ব্যবস্থা একটা কাঠামোগত আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসেবে চলতে থাকে যার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সমর্থ হয় সমাজের সুবিধেভোগী শ্রেণীগুলি। এর কারণ কী? শাসক দল গ্রামাঞ্চলে সমাজের নিচুতলার মানুষদের স্বার্থের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে না। ফলে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গরিব মানুষের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হতে পারে না। কার্যত পশ্চিমবঙ্গে বাম সরকারের এখানেই ব্যর্থতা প্রতিফলিত হতে থাকে— যত সময় যায়। ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতা বজায় রাখতে যতটা তৎপর ততটাই জনস্বার্থ বজায় রাখতে বিমুখ হয়ে ওঠে। শোষক সম্প্রদায়ের শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে যত জড়িয়ে পড়ে তত-ই এটা অনিবার্য হয়ে ওঠে। নতুন আর্থিক নীতি কার্যকর করার দায়িত্বে থাকা সরকার ও দলের কাছে এটা বাধ্যবাধকতা হয়ে দাঁড়ায়। প্রধান দল হিসেবে সিপিএম পশ্চায়েত স্তরে কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখতে, বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থে সরকারের সংগে পার্টি সংগঠনকে জুড়ে দেয়।

গত ৩৪ বছরে বামফ্রন্ট শাসনের প্রাথমিক কয়েকটা বছর যাওয়ার পর থেকেই সিপিএমের জনবিরোধী চরিত্রটা প্রকাশ পেতে থাকে। প্রথমে শহরে শ্রমিক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এটা প্রকাশ পায়। চা-বাগানে শ্রমিক আন্দোলনে তা প্রসারিত হয়। ১৯৯১ সালের আর্থিক নীতি গ্রহণ করে ২০০৬ সালের থেকে পুঁজিপতিদের স্বার্থে গ্রামে জমি দখলের ক্ষেত্রে তা উগ্রভাবে উদঘাটিত হতে থাকে। জমি অধিগ্রহণের তাগিদে পার্টিকে পুলিশের সাথে সরাসরি যুক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় পার্টি নেতাদের আমলাতান্ত্রিক চরিত্র আরো জোরদার হয়। তারা পঞ্চায়েতকে সরকারের জনবিরোধী কাজে সামিল হতে বাধ্য করে। এতে পার্টির সাথে জনগণের দূরত্ব যেমন বাড়ে তেমনি পার্টির মধ্যে কর্মীদের সাথে নেতৃত্বের বৈরিতা বাড়ে। নন্দীগ্রামের ঘটনার পর গ্রামাঞ্চলে কার্যত পার্টি ব্যাপক ভাঙনের মুখে পরে, দলের বহু কর্মী দল ছেড়ে সরাসরি আন্দোলনে যোগ দেয়, শহিদের মৃত্যুবরণ করে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় গ্রামীণ ভারতকে অগ্নিগর্ভ করে তোলে। মমতা এই আন্দোলনকে শুধু সমর্থন করেন না, এর নেতৃত্ব দখল করেন। এই পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় তিনি সেফটি-ভাল্ব হিসেবে গণ্য হন। কার্যকর বিকল্পের অভাবে সাধারণ মানুষ তাকেই নেত্রী হিসেবে গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে জিতে তিনি রাজ্যে ক্ষমতায় আসেন।

মমতা ক্ষমতায় আসার পর এক নতুন পর্যায় শুরু হয়। মমতা জানেন যে সিপিএমের মতো তার একটা সংগঠিত দল নেই যদিও ব্যাপক জনসমর্থন আছে। ইতিমধ্যে বাম রাজত্বের কল্যাণে মানুষের মধ্যে একটা বাম-বিরোধী উন্মাদনা তৈরি হয়েছে। একে পুঁজি করে মমতা অরাজনীতিকরণের পথ গ্রহণ করেন, যাতে দল নয়, অনুগত আমলাতন্ত্র ও বুদ্ধিজীবীদের সাহায্যে তিনি সরকার চালাতে পারেন। কার্যত আমলাতন্ত্রের সাহায্যে দলতন্ত্রের জায়গায় ব্যক্তিতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সরকার চালানোর প্রস্তুতি শুরু হয়। সেই জন্যই পুরোনো খ্যাত-অখ্যাত পুলিশ-আইএএস আমলার এত ভিড় এই দলে। এই ব্যক্তিতন্ত্র-ই স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে বলে আশঙ্কা হয়। এর-ই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে স্কুল থেকে পঞ্চায়েত সর্বত্র প্রতিনিধিত্বমূলক দলীয় আমলাতান্ত্রিক গণতন্ত্র থেকে ব্যক্তিভিত্তিক আমলাতন্ত্রে রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে। যদিও নির্বাচনী ব্যবস্থাকে শিখন্ডি করে রাখা হবে। আজ কর্পোরেট শাসনেরও এটাই অভীষ্ট। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র বজায় রেখেই এটা করা হবে। পরিচালন-শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে রাজনীতিকে একটা জীবিকা বলে প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। মেধাকে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতার ওপর স্থান দেওয়ার গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে অনেকদিন থেকেই। সেই জন্যই 'একসেলেন্স' কথাটার আমদানি। এই জন্যে দরকার পঞ্চায়েত থেকে রাজ্য পরিচালনায় সরাসরি আমলাতন্ত্রকে নিয়ে আসা। রাজনীতিবিদদের-ও আমলাতান্ত্রিকরণ। এই চক্রান্তই আজ রাজ্য জুড়ে চলছে। তবে এই প্রক্রিয়ায় শাসক শ্রেণীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হবে সন্দেহ নেই।

এখনো বিষয়টা প্রস্তাবের পর্যায়ে থাকায়, এটা কীভাবে কতটা কার্যকর হতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে যেহেতু বর্তমান পঞ্চায়েতের অপপ্রয়োগের ওপর দাঁড়িয়ে নতুন ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে তাই মানুষ বিকল্প ব্যবস্থার প্রতি মোহগ্রস্ত হতে পারেন। নতুন প্রস্তাবটা এসেছে সততা, স্বচ্ছতা ও নিপুণতার দাবি নিয়ে। ধরে নেওয়া হচ্ছে যে রাজনীতির জগতের লোকেরা-ই অসৎ, দুর্নীতিপরায়ণ, অস্বচ্ছ এবং

অনিপুণ। আমলা, বিশেষজ্ঞ, অরাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা সব সৎ, স্বচ্ছ আর নিপুণ। আমলারা সব উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা। কিন্তু বাস্তবে ইতিমধ্যেই ধরা পড়েছে বিশ্বায়নের জমানায় সবচেয়ে বড় আর্থিক কেলেংকারিগুলির পিছনে সুনিশ্চিতভাবেই আছে আমলাতন্ত্রের উপস্থিতি। সুতরাং আমলাতন্ত্রের আঁটোসাঁটো বাঁধনে সবই স্বচ্ছ, সৎ, গতিসম্পন্ন হয়ে যাবে ভাবার কারণ নেই। পশ্চিমবঙ্গে নানা দুর্নীতি সত্ত্বেও এটা স্বীকার্য যে তুলনায় বাম নেতারা অর্থ আত্মসাতে অনেক পেছিয়ে আছে। তবে ক্ষমতার দুর্নীতিতে তারা কম যায় না। ক্ষমতা ধরে রাখার স্বার্থে তারা দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী, কালোবাজারি, মাফিয়াদের নিয়ে এক দুর্বৃত্তের বৃত্ত গড়ে তুলেছিল সন্দেহ নেই। এর ফসলটা প্রধানত দল ভোগ করে। এই দুর্নীতি বজায় রাখতেও আর্থিক দুর্নীতিতে জড়াতে হয়। সেটা অবশ্যই কাম্য নয়। কিন্তু আমলাতন্ত্রের বাঁধুনিতে দুর্নীতি তো দূর হবেই না বরং বাড়বে। কারণ খাওয়ার ভাগ জনপ্রতিনিধিরাও ছাড়বে না। তখন দুয়ে মিলে করে খাই-এর দর্শন চালু হবে। অথচ মানুষের কাছে দায়বদ্ধতার যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাও থাকবে না। গণতন্ত্রের পরিসরটা আরো সংকুচিত হবে। আমলাতন্ত্র-ই দায়িত্ব নেবে দুর্নীতি আড়াল করার। তাছাড়া উন্নয়নের জন্য খরচ বরাদ্দ কীভাবে ঠিক হবে, তা কীভাবে বন্টিত হবে সবটাই ঠিক হবে আমলাতান্ত্রিক কায়দায়। গোপনে। আর স্বচ্ছতার উদাহরণগত আমরা রোজ-ই পাচ্ছি আমলাতন্ত্রের ফিতের আড়াল থেকে। পুলিশ, করবিভাগ, স্বরাষ্ট্রদপ্তর, বিডিও, স্বাস্থ্য সব বিভাগই সততা, স্বচ্ছতা আর গতিশীলতার অবাধ উদাহরণ রোজই রেখে চলেছে। রাইটার্স বা বিডিও অফিসের বেষ্টনী সাধারণ মানুষের রোষে ভেদ করা কঠিন হলেও গ্রামীণ সমাজে গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্নীতিগ্রস্ত অফিস ভাঙতে বেশি সময় লাগে না। এটা বোধহয় আজকের শাসক সম্প্রদায়ের ভয়। তারা জানে তৃণমূলস্তরের তাদের সংগঠনের অবস্থা।

মমতার দলীয় সংগঠনের প্রকৃত অর্থে স্থায়ী গণভিত্তিই নেই, যা পঞ্চায়েতের বিশাল ব্যবস্থাকে দলীয় স্বার্থে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। নন্দীগ্রামে জমি লুঠের বিরুদ্ধে ন্যায্য লড়াইয়ে মানুষকে সংগঠিত রাখা সম্ভব হয়েছিল অন্যান্য দলের সঙ্গে একজোট থেকে। কিন্তু পঞ্চায়েতের দুর্নীতির মুখে এটা সম্ভব নয়। তাই কি তারা পঞ্চায়েতকে আমলাতন্ত্রের আড়ালে রাখতে চাইছে? তাতে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়। নিজেদের অপরাধ আড়াল করা যায়, আবার কর্পোরেট বিভাগের শাসনের কাজকে একটু এগিয়ে দিয়ে তাদেরও সন্তুষ্ট করা যায়। তাছাড়া আমলাদের মাধ্যমে রাইটার্সের কর্তৃত্ব চূড়ান্ত হলে ব্যক্তিতন্ত্রর বজ্র আঁটুনিও আরো শক্ত হয়।

রণেশ রায়

নিউক্লিয়ার জ্বালানির সমস্যা

সম্প্রতি মার্কিন দেশের ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণাপত্র (৫ সেপ্টেম্বর ২০১১) থেকে জানা গেছে যে বর্তমানে সারা পৃথিবীতে চালু নিউক্লিয়ার চুল্লিগুলি বছরে ৬৭ হাজার টন উচ্চ মানের নিউক্লিয়ার জ্বালানি ব্যবহার করে। বর্তমানের খনি প্রযুক্তির সাহায্যে মাটির তলার যে স্তর পর্যন্ত খুঁড়ে ইউরেনিয়াম উত্তোলন করা সম্ভব, সেই পরিমাণটা অনুমান করা হচ্ছে ৪০-৫০ টন, অর্থাৎ আমাদের হাতে রয়েছে মাত্র ৪২ বছরের নিউক্লিয়ার জ্বালানি। মনে রাখতে হবে, কোদাইকুলম চালু হতে সময় নেবে কমবেশি ২৫ বছর, এবং তা পূর্ণ দক্ষতায় চললে তার আয়ু হতে পারে বড় জোর ২৫ বছর। এর মধ্যে অন্তত দু বছর সময় নিয়মমাফিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বন্ধ রাখতে হবে। জ্বালানি আসবে কোথা থেকে? ভারতের ইউরেনিয়ামের ভাণ্ডারের যে হিসেব ভারতের পরমাণু মন্ত্রক পেশ করেন, তা থেকে জানা যাচ্ছে সেই পরিমাণ ইউরেনিয়াম দিয়ে ভারতের সমস্ত নিউক্লিয়ার চুল্লি পূর্ণ দক্ষতায় চলতে পারে তিন থেকে পাঁচ বছর! আর যদি মনমোহন সিং-এর 'স্বপ্ন', বছরে গড়ে ৪টি করে নিউক্লিয়ার চুল্লি মার্কিন দেশ-রাশিয়া-ফ্রান্স থেকে আমদানি করা হয়, তবে তিন বছরের মধ্যেই ভারতের নিজস্ব নিউক্লিয়ার জ্বালানির ভাঁড়ারে মা ভবানী দেখা দেবেন।

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

বাণিজ্যিক নয়, মানবিক

স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক বাংলা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান: পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপলস বুক সোসাইটি, বই-চিত্র, অমর কোলের স্টল (বিবাদি বাগ), অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধানসভা পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডা. শুভজিত ভট্টাচার্য (উযুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া), শিয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন স্টেশনে বইয়ের স্টল

পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর: ৯৮৩০৯ ২২১৯৪ বা ৯৩৩১৯ ১২৫৩৭

পত্রপত্রিকা থেকে

বিদ্যুতের চার্জ বৃদ্ধি ও একটি মিথ্যা গল্প

বিদ্যুতের দাম আবার বাড়িতে চলিয়াছে। বেশ কিছুদিন ধরিয়া বিভিন্ন মিডিয়ার একটানা প্রচারে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি করিবার ভালমতো পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে। ঘাড়ের উপর যে কোনদিন কোপ পড়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। বলা হইতেছে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির কোটি কোটি টাকা লোকসান বাড়িয়াই চলিতেছে। কয়লার দাম বাড়িয়াছে। অর্থের অভাবে জোগান প্রায় বন্ধ হইবার জোগাড়। কয়লা সংস্থা বাঁকিয়া বসিয়াছে। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমাইয়া দেওয়া হইতেছে। এতসব কাণ্ডকারখানা করিয়া সোরগোল তোলা হইতেছে এই আশায় যে রাজ্যের জনগণ বিদ্যুতের চার্জ বৃদ্ধির দড়ি হাসিমুখে পরিয়া যেন ঝুলিয়া যাইতে পারে। এক বামফ্রন্ট আমলেই বিদ্যুতের ২৫ গুণ চার্জ বাড়িয়াছে। অন্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যে বিদ্যুতের দাম বেশি। তৎসত্ত্বেও কোম্পানিগুলির পেট ভরিতেছে না। তাহার উপর বামফ্রন্ট মনোনীত বিদ্যুৎ কমিশন এমভিসিএ নামে একটি রেগুলেশন চালু করিয়াছে, যাহার ফলে বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলি প্রতি মাসেই বিদ্যুতের দাম বাড়াইবার অধিকার পাইয়াছে। এই অধিকারেই তাহারা দাম বাড়াইবার দাবি তুলিতেছে। রাজ্য সরকারের পরিবর্তন হইয়াছে। বামফ্রন্ট মনোনীত প্রায় সব কমিটিরই পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে বামফ্রন্ট মনোনীত বিদ্যুৎ কমিশনের পরিবর্তন হয় নাই। পরিবর্তন হয় নাই রাজ্যের বিদ্যুৎ নীতির।

যুগটাই হইতেছে বিদ্যুৎ যুগ। সাধারণ মানুষ কী পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করিতেছে তাহা দিয়া দেশটি কত উন্নত তাহা বোঝা যায়। কিছুকাল পূর্বে রাজ্যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিত শতকরা ২৭ ভাগ মানুষ। সরকারের দাবি বর্তমানে ইহা ৪৭ ভাগ। অর্থাৎ সরকারের দাবি অনুযায়ী স্বাধীনতার ৬৪ বছর পরও ৫৩ ভাগ মানুষ আজিও বিদ্যুতের আলো হইতে বঞ্চিত। আবার যতটুকু বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় তাহা ব্যবসা এবং মুনাফার স্বার্থে। সভ্যতার অগ্রগতির জন্যই শিক্ষার আলো, বিদ্যুতের আলো এই দুই আলো ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। বিদ্যুতের সমস্যা হইতেছে সমস্ত মানুষের দ্বারে তাহা পৌঁছাইয়া দেওয়া। দ্বিতীয় সমস্যা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ভোল্টেজের সমস্যা। মূল সমস্যা হইল বিদ্যুৎকে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখা। এই কয়েকটি কাজ করিতে হইলে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা দরকার। বিদ্যুৎনীতির পরিবর্তন করা প্রয়োজন। বিদ্যুৎকে পণ্য হিসাবে মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিলে তাহা সম্ভব নহে। বিশ্বায়নের দোহাই দিয়া তাহাই করা হইতেছে। বিদ্যুৎ এখন পরিষেবা নয়। বিদ্যুতে জনগণের অধিকার নেই। বিদ্যুৎ মালিকশ্রেণীর হাতে একচেটিয়া মুনাফার উদ্দেশ্যে আজ একটি পণ্য। বিজ্ঞানের অবদান থেকে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত। আর এইভাবে শিক্ষা, চিকিৎসা, পানীয় জল ইত্যাদিকে পণ্যের চরিত্রে রূপান্তরিত করা হইতেছে। অথচ পৃথিবীর মানুষ একদিন জানিত এইগুলি পরিষেবার বিষয়। সরকার তাহা মানুষের জন্য মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দিবে। আর ইহারই জন্য সরকারি ট্যাক্সনীতি। এমনকি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুও বিদ্যুৎকে পরিষেবা হিসাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন। আজ তার দল কংগ্রেস, বিজেপি, এমনকি সিপিএমও বিদ্যুৎকে পণ্য বানাইয়াছে। পরিষেবা যদি কিনিতেই হয়, তাহা হইলে মানুষ ট্যাক্স দেবে কী জন্য? ট্যাক্সের বোঝা প্রতিদিন বাড়িতেছে কেন? সরকার কী জন্য? কাহার জন্য? সাধারণ মানুষের ট্যাক্সের টাকা সরকার কোথায় খরচ করিবে? তাহা কি মালিক, শিল্পপতি কর্পোরেট হাউসকে অনুদান, ভর্তুকি এবং মুনাফা করিতে দেওয়ার জন্য? মধ্যপ্রাচ্যে পেট্রোল, ডিজেল জলের চেয়ে কম দরে মানুষ কিনিতে পারে। ওই দেশগুলিতে তাহা পরিষেবার বস্তু। মুনাফার নয়।

দেশের মানুষ ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে বিদ্যুৎ পাইলে শিক্ষার হার বাড়িবে। চিকিৎসার সুফল বৃদ্ধি পাইবে। কৃষি-শিল্পে উৎপাদন বহুগুণ বাড়িবে। একটি সরকারের শুধু সদিচ্ছা থাকিলেই তাহা করা সম্ভব। তাহার ভর্তুকিও দিতে হইবে না। বিদ্যুৎ উৎপাদনে লোকসানের প্রশ্নই নেই। বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলি বলিতেছে লোকসান হইতেছে। মিথ্যা কথা। এই রাজ্যে ১ ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন করিতে খরচ হয় ১ টাকা ৯০ পয়সা। এই কথা সরকারের। বর্তমানে বিদ্যুতের গড় ইউনিট প্রতি ৪ টাকা ২৭ পয়সা। বণ্টন কোম্পানি ৫ টাকা ০৫ পয়সা ইউনিট প্রতি দাবি করিতেছে। ইহার সহিত ২০১১-১২-এর এরিয়ার যুক্ত হইলে ইউনিট প্রতি দাম পড়িবে ৬ টাকা। মানুষ বিদ্যুৎ কিনিতে পারিবে? কয়লা লইয়া দুর্নীতি চলিতেছে। বিদ্যুৎ-অফিসার, মাফিয়া যোগসাজসে বেশি দাম দিয়া নিম্নমানের কয়লা কেনা হইতেছে। এই চুরির অর্থ গ্রাহক দিবে কেন? মিটার লইয়া চরম দুর্নীতি। মন্ত্রীর আত্মীয় জড়িত। তাহার ব্যয় মানুষ বহন করিবে কেন? সরকার কয়লা ও মিটার দুর্নীতি স্বীকার করিয়াছে। তাহা হইলে তাহার দায় বিদ্যুৎ কোম্পানির উপরই চাপানোর কথা। কয়লা-মিটার দুর্নীতি বন্ধ করিতে পারিলে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন-সঞ্চালন-বণ্টন এই তিনধাপে ১৬.৫ শতাংশ মুনাফা করিবার যে আইন বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ করিয়াছে সেই মুনাফা ৭ থেকে ৮ শতাংশ হারে করিলেও কোম্পানির লাভ হইবে। বিদ্যুতের ইউনিট প্রতি গড় দাম ২ টাকা করা যাইবে। বিদ্যুৎ সংগঠন অ্যাবেকা অংক কষিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। ইহার সহিত কোম্পানিগুলি চুরি বন্ধ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দিলে উহা করা সম্ভব। রাজ্যের প্ল্যান্টগুলির উৎপাদন ক্ষমতা ১২০০০

এর পর ১৮ পৃষ্ঠায়

বক্তৃতা

এই সংগ্রাম আমাদের কল্পনাকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে

অরুন্ধতী রায়

মঙ্গলবার সকালে পুলিশ এসে জুকোত্তি পার্ক ফাঁকা করে দিয়েছিল, কিন্তু আজ আবার সেখানে সবাই ফিরে এসেছেন। পুলিশের জানা উচিত যে এই প্রতিবাদ কোনো এলাকা দখলের লড়াই নয়। আমরা এখানে-সেখানে কোনো একটা পার্ক দখল করার জন্য লড়াই করছি না। আমাদের লড়াই ন্যায়ের জন্য। শুধু মার্কিন নাগরিকদের জন্য নয়, সবার জন্য ন্যায়।

১৭ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই দখলের আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে আপনারা যেটা অর্জন করেছেন সেটা হলো একটা নতুন কল্পনার দুয়ার খুলে দেওয়া, সাম্রাজ্যের ঠিক মাঝখানে নতুন একটা রাজনৈতিক ভাষা নিয়ে আসা। যে ব্যবস্থাটা সবাইকে হৃদয়হীন যন্ত্র বানানোর চেষ্টা করছে, যারা অকারণ ভোগবাদকেই মনে করে আনন্দ ও সম্পূর্ণতা, সেই ব্যবস্থার মাঝখানে আপনারা স্বপ্ন দেখার অধিকারকে স্থাপন করেছেন।

একজন লেখক হিসেবে আমি বলবো যে এটা একটা বিরাট অর্জন। এর জন্য কোনো ধন্যবাদই যথেষ্ট নয়।

আমরা বলছি ন্যায়ের কথা। আজ আমরা যখন এই কথা বলছি সেই সময়ে মার্কিন সেনাবাহিনী ইরাক ও আফগানিস্থানে এক দখলদারির যুদ্ধ চালাচ্ছে। মার্কিন গোয়েন্দা বিমান পাকিস্তানে ও অন্যত্র অসামরিক ব্যক্তিদের হত্যা করছে। লাখে লাখে মার্কিন সেনা, মারণ বাহিনী আফ্রিকায় ঢুকছে। ইরাক ও আফগানিস্থান দখল করে রাখার জন্য আপনাদের লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করাও যেন যথেষ্ট হচ্ছে না, ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা চলছে।

বিরাট মন্দার পর থেকে অস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানি হয়ে উঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনীতির একটা মূল দিক। এই সম্প্রতি, প্রেসিডেন্ট ওবামার আমলেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৬০০০ কোটি ডলারের একটা অস্ত্র চুক্তি করেছে সৌদি আরবের সঙ্গে— ওরা মডারেট মুসলিম— তাই না? সংযুক্ত আমিরশাহীর কাছে ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের হাজার হাজার বাঙ্কার-বাস্টার বেচার আশা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ওরা ৫০০ কোটি ডলারের সামরিক বিমান বেচেছে আমার দেশ ভারতের কাছে, সেই ভারত যেখানে গরিব মানুষের সংখ্যা আফ্রিকার সমস্ত হতদরিদ্র দেশের গরিবদের মোট সংখ্যার চেয়ে বেশি। এইসব যুদ্ধ— হিরোশিমা-নাগাসাকিতে বোমানিক্ষেপ থেকে ভিয়েতনাম, কোরিয়া, লাতিন আমেরিকা— যাতে প্রাণ হারিয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ, এগুলি সব লড়া হয়েছে ''মার্কিন ধরনের জীবনধারণ'' নিশ্চিত করতে।

আজ আমরা জানি যে ''মার্কিন ধরনের জীবনযাপন'', সারা বিশ্বের মানুষের সামনে যাকে মডেল হিসেবে তুলে ধরা হয়— এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধেক মানুষের সম্পদের সমান সম্পদ রয়েছে ৪০০ মানুষের হাতে। এর ফলে হাজার হাজার মানুষকে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে, চাকরি থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে, আর মার্কিন দেশের সরকার তখন ব্যাংক আর কর্পোরেশনগুলিকে বাঁচাতে ব্যস্ত থেকেছেন— শুধুমাত্র আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল গ্রুপ বা এআইজি-কেই দেওয়া হয়েছে ১৮২০০ কোটি ডলার।

ভারত সরকার মার্কিন অর্থনৈতিক নীতির পূজারী। গত ২০ বছরের মুক্ত বাজার অর্থনীতি চলার ফলে আজ ভারতের ১০০ জন ধনীশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সম্পদের পরিমাণ জাতীয় আয়ের এক-চতুর্থাংশ, আর ৮০ শতাংশ লোকের হাতে প্রতিদিন আধ ডলার খরচ করার পয়সাও নেই। দেনার দায়ে আত্মহত্যা করেছেন ২৫ লক্ষ কৃষক। একে বলা হচ্ছে প্রগতি, মনে করা হচ্ছে যে আমরা একটি বৃহৎ শক্তি, একটি সুপারপাওয়ার, হয়ে উঠেছি। আপনাদের মতো ক্ষমতা আছে আমাদেরও। অ্যাটম বোমা আছে আমাদের, অশ্লীল ধরনের অসাম্যও আছে।

ভালো খবর এই যে, মানুষ তাদের সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন। তারা আর সহ্য করতে রাজি নন। বিশ্বের সর্বত্র হাজার হাজার প্রতিরোধ আন্দোলন চলছে, যেখানে দরিদ্রতম মানুষরা উঠে দাঁড়িয়ে বিশ্বের ধনীতম কর্পোরেশনগুলিকে রুখে দিচ্ছেন। সেই আন্দোলনগুলির সঙ্গে এখন যোগ দিয়েছে এই অকুপাই আন্দোলন। আমরা প্রায় কেউই ভাবতে পারিনি যে আমরা আপনাদের, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষদের, আমাদের পক্ষে দেখবো। দেখবো যে সাম্রাজ্যের হৃদপিন্ডের উপর বসে আপনারা এটা করবেন। এটা যে কত বড়ো ব্যাপার সেটা কী ভাবে বোঝাবো তা বুঝছি না।

ওরা, যারা এক শতাংশ, ওরা বলছে যে আমাদের 'দাবি' নেই। ওরা বোধহয় জানে না যে শুধু আমাদের ক্রোধই ওদের ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু কয়েকটি কথা— ''বিপ্লবপূর্ব'' চিন্তার কথা— আমি আপনাদের বলবো, যাতে তা নিয়ে আমরা সবাই ভাবতে পারি।

আমরা চাই এই ব্যবস্থাটাকে, অসাম্য উৎপাদনকারী এই ব্যবস্থাটাকে, বন্ধ করতে। আমরা চাই ব্যক্তির হাতে বা কর্পোরেশনগুলির হাতে সম্পদ ও সম্পত্তির অসীম সঞ্চয় বন্ধ করতে। আমাদের দাবি:

এক, ব্যবসাবাণিজ্যে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান মালিকানা (cross

ownership) বন্ধ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অস্ত্র ব্যবসায়ীরা টিভি চ্যানেলের মালিক হবেন না। খনি কোম্পানিগুলি খবরের কাগজ চালাতে পারবে না। ব্যবসায়ী গোষ্ঠী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রক হতে পারবে না। ওষুধ কোম্পানিগুলি সরকারি স্বাস্থ্য খাতের টাকা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।

দুই, প্রাকৃতিক সম্পদ আর অবশ্যপ্রয়োজনীয় পরিকাঠামো— যেমন জল, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা— এগুলির বেসরকারিকরণ চলবে না।

তিন, প্রত্যেকের আশ্রয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা পাওয়ার অধিকার থাকবে।

চার, ধনীদের সন্তানরা তাদের পিতামাতার ধনের উত্তরাধিকার পাবে না।

এই সংগ্রাম আমাদের কল্পনাকে পুনর্জাগ্রত করেছে। চলার পথে পুঁজিবাদ ন্যায়ের ধারণাকে ছোট করে তাকে 'মানবাধিকারের' সমার্থক করে তুলেছে; আর সাম্যের স্বপ্ন দেখাটাও যেন অপরাধ হয়ে পড়েছে। যে ব্যবস্থাটাকে বদলানো দরকার তাকে তালি তাপ্পা দিয়ে চালানোর জন্য আমরা লড়ছি না।

আপনাদের সংগ্রামকে সেলাম জানাই।

সেলাম! জিন্দাবাদ!

নভেম্বর মাসে নিউ ইয়র্কের ওয়াশিংটন স্কোয়ারে পিপলস ইউনিভার্সিটিতে অরুন্ধতী রায়ের বক্তৃতা। Countercurrents.org 20 November, ২০১১ থেকে গৃহীত। অনুবাদ আমাদের।

স্মরণ : ভূপেন হাজারিকা

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আসামেরই এক সমাজবিজ্ঞানী ভারতীয়ত্বের সাথে অসমীয়া জাতিসত্তার সাথে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন: ভারত হচ্ছে একটা মহাসাগরের মতো, বিভিন্ন স্বতন্ত্র জাতিসত্তার প্রবহমান নদীগুলি মিলে যাকে সমৃদ্ধ করছে— সেগুলিকে স্বীকৃতি না দিয়ে বিচ্ছিন্ন এক ভারতীয় জাতিসত্তার কোনো অস্তিত্বই থাকতে পারে না। এই বক্তব্যেরই সমকালীন অন্যতম দৃষ্টান্তের নাম ভূপেন হাজারিকা। অসমবাসীর কাছে তিনি ছিলেন অসমীয়া জাতিসত্তার উজ্জ্বল প্রতীক। তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তার প্রকাশ সম্প্রতি ঘটেছে তাঁর মৃত্যু-পরবর্তীকালে, যেটা এর জ্বলন্ত প্রমাণ। আবার সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষিতেও তাঁকে, এবং তাঁর সেই অসমীয়া মৌলিক সত্তাকে মুছে ফেলা যাবে না।

সংস্কৃতির ও বিদ্যাচর্চার নানা বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর বিচরণ ও সাফল্য তাঁকে বারবার পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরলেও, তাঁর প্রাথমিক ও মূল প্রকাশ ঘটেছিল অসমীয়া লোকসঙ্গীত ও তার উপর নির্ভরশীল গণসঙ্গীতের মধ্যে দিয়েই। বাল্যকাল থেকেই একই সাথে সংকীর্ণ অর্থে অসমীয়া ও বৃহৎ অর্থে ভারতীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি শ্রেণীসংগ্রামের চেতনারও প্রকাশ তাঁর মধ্যে ধরা পড়েছে। চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে কৃষক আন্দোলনের সাংস্কৃতিক প্রকাশ যখন ঘটছে সমগ্র পূর্ব ভারতের মতো আসামেও, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ, এবং একই সময়ে গণনাট্য আন্দোলনের অন্যতম সৈনিকের ভূমিকা তাঁকে মানুষের আরও বেশি কাছাকাছি নিয়ে গেছে। সমকালীন আর এক উজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সহযোদ্ধার ভূমিকা তাঁকে আরও বরণীয় করে তুলেছে। যে কারণে ১৯৬০-এর শুরুতে আসামে যখন বাঙালী খেদাও-এর সংকীর্ণ প্রকাশ জাতিগত সম্প্রীতির মূলে আঘাত করতে শুরু করেছে, তখন হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও তিনি যেভাবে সমগ্র আসামজুড়ে তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিলেন, পরবর্তীকালেও আসামের প্রগতিশীল মানুষ সেই উজ্জ্বল স্মৃতি বহন করে চলেছেন।

কিন্তু প্রদীপের নিচেই বাসা বেঁধে থেকে অন্ধকার যেমন মাথা তোলে, ঠিক যেমনটি ঘটেছিল সলিল চৌধুরীর ক্ষেত্রেও, বাণিজ্যিক সংস্কৃতির হাতছানিতে গণআন্দোলন থেকে ক্রমবিচ্ছিন্নতার কারণে, ঠিক তেমনি ঘটেছিল ভূপেন হাজারিকার ক্ষেত্রেও। তাই বাণিজ্যিক ও উগ্র জাতিদাম্ভিকতার কাছে নতি স্বীকার করে সেই পঞ্চাশের দশকের শুরুতে চীন বিপ্লবের বার্তাকে আবাহন করে রচিত তাঁর অবিস্মরণীয় গান 'প্রতিধ্বনি শুনি'-র কথা বিকৃত করে ও তার মূল রাজনৈতিক সত্তা মুছে দিয়ে পরবর্তীকালে রেকর্ড করতে তাঁর বাধে নি; সংকুচিত হন নি 'ক্ষুদ্র' জাতিসত্তার চেতনার মৌলিক বিরোধী উগ্র জাতীয়তার দর্শনে গড়ে-ওঠা বিজেপি-র সমর্থনে সংসদীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেও। এই সব অন্ধকার তাঁর উজ্জ্বল স্মৃতিকেও অনেকটাই ম্লান করে দিয়েছে।

তবু আসামে লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীতের বিকাশে, এবং অসমীয়া জাতিসত্তার আত্মপরিচয়ের সংগ্রামে তাঁর গৌরবময় ভূমিকাকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাতেই হবে।

দীপংকর চক্রবর্তী

শৈবাল মিত্র স্মরণে

ষাটের দশকের ছাত্র-আন্দোলনের কাহিনী যতই ইতিহাস হয়ে উঠছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেই আন্দোলনের স্থপতিবৃন্দ অবধারিতভাবেই প্রৌঢ়ত্বের দিকে এগোচ্ছেন। প্রায় অর্ধ-শতক আগে ঘটে যাওয়া কাহিনীর নায়কবৃন্দ ছিলেন একঝাঁক তরতাজা তরুণ, অনেকেরই বয়স তখন সদ্য পা রেখেছে ২০ পেরিয়ে একুশে। গত শতাব্দীর সেই মানুষদের একজন ছিলেন শৈবাল মিত্র (১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩- ২৭ নভেম্বর ২০১১)— যাঁর মৃত্যুতে গণ-আন্দোলনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের এক বিরাট প্যারাগ্রাফে যতিচিহ্ন যোগ হলো।

মৃত্যুর পর মানুষকে মহান প্রতিপন্ন করার যে চেষ্টা মূল স্রোতের সংবাদমাধ্যমের থাকে, সেই 'সাংবাদিকতা'-র তীক্ষ্ম নজর শৈবাল মিত্রকেও রেহাই দেয়নি— আদ্যন্ত রাজনৈতিক, মনেপ্রাণে মানুষের মুক্তিকামী এই মানুষটি চিত্রিত হচ্ছেন শুধুই 'সাহিত্যিক শৈবাল মিত্র' হিসাবে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আশা-নিরাশা কণ্টকিত যে দুটি দশক শৈবাল-এর প্রজন্ম পেরিয়ে এসেছিলেন, সেখানে 'বিদ্রোহ' করাই ছিল 'ন্যায়সঙ্গত' পদক্ষেপ। ষাটের দশকের যে ছাত্র-আন্দোলন গণ-আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে, তাদের স্থপতিদের মধ্যে অন্যতম নাম শৈবাল মিত্র। ম্যাকনামারার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন, রাজাবাজারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে ছাত্রদের প্রতিরোধ, কৃষক আন্দোলন ও ট্রামশ্রমিকদের সমর্থনে আন্দোলনে ছিল তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি— ফলে গ্রেপ্তার ছিল অবধারিত। উদ্যত আঙ্গুলির যে দিক-নির্দেশ থাকে আগামীর দূর-দিগন্তের প্রতি, শৈবালের পরিণত মননে তা সহজেই ধরা পড়েছিল— তিনি বড় মাপের চৈতন্য নিয়ে বড় মাপের পরিকল্পনার পক্ষপাতী ছিলেন, যার নিশ্চিত সাক্ষ্য বহন করেছে পরবর্তী ইতিহাস। সাহিত্যে ছিল তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতা, চৈতন্যে ছিল সংস্কৃতি। তাই তিনি অনায়াসে সংস্পর্শে আসেন নাট্যকার উৎপল দত্তের, প্রকাশ করেন *ছাত্রফৌজ* পত্রিকা, সংগ্রামের প্রলয় ঝঞ্ঝায় আসীন হয়ে রচনা করেন কবিতাগ্রন্থ। তাঁর আত্মজৈবনিক রচনায় পত্রস্থ করেন ভোররাতে গ্রেপ্তারের কাহিনী— 'খুনে গুন্ডা কমিউনিস্টরা' পুলিশ ভ্যানে সুর তোলেন 'তুমি ডাক দিয়েছো কোন সকালে'।

শৈবাল ৭০-এর আন্দোলনের একটি পর্বে এসে আন্দোলনে আর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী ছিলেন না— কিন্তু তিনি আন্দোলন থেকে গুটিয়ে নেওয়ার মানুষও ছিলেন না। তিনি তাঁর নিজের পরিসরে, নিজের মতো করে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। কলমকে হাতিয়ার করে নানান কাহিনীর (সত্য ঘটনার প্রতিরূপ) মাধ্যমে অনতি-অতীতকে সমসাময়িক করার দুর্মর প্রয়াসে লিপ্ত ছিলেন। তিনি অনেক বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন, বিতর্কে বিরুদ্ধপক্ষে অবস্থান-কারীদেরও ব্রাত্য করেন নি। জরুরি অবস্থার শেষ দিকে, মূলত তাঁর একক প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে 'বন্দীমুক্তি গণদাবি প্রস্তুতি কমিটি'— যার মধ্যে ছায়া পাওয়া যায় ১৯৪৭-পূর্ব বন্দীমুক্তি আন্দোলনের। সমাজের নানা স্তর থেকে মানুষ জমায়েতের ললিতকলায় দক্ষ শৈবাল দাবিকে কী ভাবে সংহত অবয়ব প্রদান করা যায়, তার এক অনবদ্য নিদর্শন রেখে গেছেন।

ষাট-সত্তরের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস চর্চারও তিনি সূত্রপাত করেন এক দীর্ঘ প্রবন্ধের মাধ্যমে। বিতর্কিত এই প্রবন্ধটি পরবর্তীকালে ঐ সময়ের বহু তথ্য প্রকাশ্যে নিয়ে আসে। ছত্রিশগড় আন্দোলনের রূপকার প্রয়াত শঙ্কর গুহনিয়োগীর ছত্তিশগড় নিয়ে তাঁর অসামান্য (যদিও বিতর্কিত) কাহিনী ভোলার নয়। তিনি *কবিপত্র* পত্রিকার যুগ্মসম্পাদকও ছিলেন। সুবক্তা এই মানুষটি মতান্তরকে মান্যতা দিয়ে তাকে মনান্তরে নিয়ে যেতে দিতেন না। গণ-আন্দোলনের নানা বিষয়ে, হার্টের রোগী এই মানুষটি উপস্থিত থেকেছেন, মিছিলে হেঁটেছেন। অশক্ত শরীরের সীমাবদ্ধতা তিনি অতিক্রম করতেন মানসিক শক্তির অবারিত উৎস থেকে— হৃদরোগের কারণে বারবার ঘর আর হাসপাতার ফেরত এই মানুষটিকে দেখলে তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে ক্রিয়াশীল আগ্নেয়-গিরির খবর মিলত না। *অনীক*-এর পুরনো পাঠকদের হয়তো স্মরণে থাকবে ১৯৮৬-এ ইয়ং পেট্রিয়টস্ সংগঠনের উদ্যোগে সংগঠিত বক্তৃতার কথা। চলমান ইতিহাস আর ঘটমান বর্তমানই এমন মানুষদের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে—কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে *অনীক*, তার পাঠককুল আর তার পাশাপাশি গণ-আন্দোলনের কর্মীরা হারালেন এক প্রকৃত দরদি মানুষকে।

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

আনন্দ হাইতের সঙ্গে কথাবার্তা*

শৈবাল মিত্র

সত্যি আমার কষ্ট হয় নি বিশেষ
কেননা আমি জানতুম এই মৃত্যু
জীবনজোড়া ব্যাপক প্রস্তুতি,
তবু হাজার স্তুতি ও নৈবেদ্য
ভালো লাগে না;
যদি না আমার রক্ত
গোলাপ হয়ে ফোটে
যদি না আমার প্রাণ
নির্বিঘ্নে হাসতে দেয়
মায়ের কোলের শিশু
ঘুম না ভাঙায় পোড়ো জমির
সবুজ দিনের স্বপ্নে,

মরে আমার ভীষণ সুখ
কেননা আমি জানি রক্তপাত সৃষ্টি করে— রক্ত রোমন্থন
জন্ম দেয় রক্তপাত— শান্তির সৈনিক।

দোহাই বন্ধু মালা গেঁথো না
আমার জন্য বেদী তুলো না
দ্বিতীয়বার কোরো না আমায় খুন।

**আনন্দ হাইত ১৯৬৬-র ঐতিহাসিক খাদ্যআন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন*

❑ অনীক: জুলাই ১৯৬৬ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত

প্রবন্ধ

লিবিয়া ও আমেরিকার আফ্রিকা অভিযান

দীপ্র চৌধুরী

আফ্রিকারই এক কৃষ্ণাঙ্গের বংশধর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক হুসেন ওবামা ন্যাটো বাহিনীর লিবিয়া দখলের পর জাতিবিদ্বেষী আগ্রাসী বাহিনীর হাতে হাজার হাজার আফ্রিকাবাসী ও কালো লিবিয়ানদের নৃশংস হত্যালীলাকে প্রকাশ্যেই দু'হাত তুলে সমর্থন জানিয়েছেন। প্রকাশ্যেই পথের দু'ধারে ঝুলিয়ে দেওয়া অত্যাচারিত বিকৃত কালো মানুষগুলির দেহগুলির দৃশ্য অনেককেই মনে পড়িয়ে দিয়েছে মাত্র একশো বছর আগে আমেরিকার লুসিয়ানায় শত শত কালো মানুষের হত্যার স্মৃতি। লিবিয়ার এই অতিসাম্প্রতিক হত্যালীলার দৃশ্য এমনকি আফ্রিকার মার্কিন-বশংবদ শাসকদেরও বাধ্য করেছে প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হতে। ঠিক সেই সময়েই কিন্তু ওবামা ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা ব্যস্ত থেকেছেন লিবিয়ায় 'মুক্তিযুদ্ধ' তথা 'গণতন্ত্রের মহান বিজয়'-এর আনন্দোৎসবে।

২০০১-এর অক্টোবর থেকে ২০১১-র অক্টোবর— এই দশ বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যাপক আক্রমণ, আগ্রাসন ও হত্যালীলা চলেছে হিন্দুকুশ পর্বত থেকে আফ্রিকায় ভূমধ্যসাগরের উত্তর কূল পর্যন্ত ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে। সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে অদূর ভবিষ্যতেই সিরিয়া ও ইরানেও সেই আগ্রাসনকে বিস্তৃত করার। অতি সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের 'সমর্থনপুষ্ট' ন্যাটোর বকলমে সাম্রাজ্যবাদের লিবিয়া বিজয় গত এক বছর ধরে প্রবহমান আরব দুনিয়ার, বিশেষত টিউনিসিয়া ও মিশরের মেরু ঝড়ের বিদ্রোহের তীব্রতাকেও অনেক পরিমাণে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে, গভীর চক্রান্ত চলছিল যে লক্ষ্যে। সম্ভবত এর মধ্যে দিয়েই শুরু হতে চলেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নতুন আগ্রাসী পদসঞ্চার— পরিণতিতে যা উনবিংশ শতাব্দীর বহু-চর্চিত 'আফ্রিকার জন্য কামড়াকামড়ি'-কেও ছাড়িয়ে যেতে পারে— এবং যার নেতৃত্বে রয়েছে শুরুতেই যার কথা বলেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট।

আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল 'সন্ত্রাস-বিরোধী যুদ্ধ'-এর অঙ্গ হিসেবে, এবং তৎসহ মানবাধিকারের অজুহাতে; ইরাকে তা শুরু হয়েছিল 'সন্ত্রাস-বিরোধী যুদ্ধ', পারমাণবিক হাতিয়ার ধ্বংস এবং মানবাধিকারের অজুহাতে; আর লিবিয়াই হচ্ছে প্রথম দেশ, যেখানে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর আগ্রাসী আক্রমণ নেমে এসেছিল শুধুই 'মানবাধিকার'-এর দোহাই দিয়ে! আগ্রাসনের প্রথম প্রহরেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন : আর এক দিন দেরি হলেই লিবিয়ার রাজধানী বেনাগাজিতে যে রক্তগঙ্গা বয়ে যেতো, তাতে অন্তত এক লক্ষ লোকের মৃত্যু হতো, এবং সারা বিশ্বের বিবেক তার সদুত্তর দিতে পারতো না। এর প্রেক্ষিতেই বয়ে গিয়েছিল প্রচারের বন্যা, যার চাপে শেষ পর্যন্ত 'মানবাধিকার'-এর দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রসংঘ (২০০৫-এ, আফগানিস্তানে ও ইরাকে মার্কিন আক্রমণ-পরবর্তীকালে, কার্যত গায়ের জোরে সংযোজিত) মানবাধিকার 'সুরক্ষার দায়িত্ব'-এর নীতি অনুসারে সবুজ বাতি দেখিয়েছিল ন্যাটো সৈন্যবাহিনীকে লিবিয়া অভিযানের 'মহান' দায়িত্ব পালনে! বস্তুত পরবর্তী ঘটনাবলী নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, 'মানবাধিকার'-এর সেই অজুহাত ছিল শতকরা একশো ভাগ মিথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, ঠিক যেমনটি ছিল ওবামা'র পূর্বসূরী ছোটো বুশের ইরাক আক্রমণে মারণাস্ত্র ধ্বংসের অজুহাত। অনেকেরই মনে পড়বে, ঠিক সেই সময়েই বুশ রাষ্ট্রসংঘ-সহ সমস্ত আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই মর্মে সোচ্চার দাবি তুলছিলেন : এই সন্ত্রাস-এর যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকার থাকছে তার 'জাতীয় নিরাপত্তা'র স্বার্থে দুনিয়ার যে কোনো দেশে আগেই সামরিক অভিযান চালাবার; এবং সেই প্রেক্ষিতে যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য জেনেভা কনভেনশনের বিধিগুলি পর্যন্ত মেনে চলার জন্য তাদের কোনো দায় থাকবে না। বুশের সেই দাবিই কার্যত সম্প্রসারিত হয়েছিল 'গণহত্যা' ঠেকাবার জন্য উদ্দেশ্যে মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে যে কোনো দেশের সার্বভৌমত্ব লঙঘন করার অধিকারের ক্ষেত্রেও। লিবিয়ার ক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম সেই অধিকার রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতি আদায় করেছিল, যার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছিল সাম্রাজ্যবাদের সেই লিবিয়া আগ্রাসন কর্মসূচির অন্যতম অংশীদার ফরাসি প্রেসিডেন্ট সারকোজির নিঃসঙ্কোচ বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে : "এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত... লিবিয়াতে যা ঘটতে চলেছে সেটি আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে... যা ফ্রান্স, ইউরোপ ও সমগ্র বিশ্বের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পটপরিবর্তনকে সূচিত করছে।"

অথচ বেনাগাজিতে সাম্রাজ্যবাদী অভিযান না চালালে অন্তত এক লক্ষ লোকের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী ছিল— যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে গদ্দাফির নিয়ন্ত্রণে থাকা এলাকাগুলিতে ওবামা'র এই দাবির সামান্যতম সত্যতারও প্রমাণ মেলে নি। উল্টো দিকে লিবিয়া দখল করার পর ন্যাটোবাহিনীর গণহত্যার বিবরণ আগেই দিয়েছি। নাইজার, মালি, চাদ প্রভৃতি লিবিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলি থেকেও সংবাদ মিলেছে, অন্তত তিন লক্ষ কৃষ্ণাঙ্গ, লিবিয়ার অপ্রতুল শ্রমিকবাহিনীতে উৎপাদনের স্বার্থে যাদের যুক্ত করা হয়েছিল, সেদেশ থেকে অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হয়েছে।

সব মিলিয়ে অন্তত ৫০ হাজার কালো মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তাদের 'মানবাধিকার সুরক্ষা'-র দায়িত্ব নিতে রাষ্ট্রসংঘ বা কৃষ্ণাঙ্গ বংশধর ওবামা'র সামান্যতম প্রচেষ্টার সংবাদ মেলেনি।

উল্লেখ্য যে, অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে, যখন সাম্রাজ্যবাদের লিবিয়া দখল নিশ্চিত হয়ে গেলেও, গদ্দাফি নৃশংসভাবে তাদের হাতে খুন হন নি, প্রেসিডেন্ট ওবামা এক ঐতিহাসিক প্রেস - সম্মেলনে ঘোষণা করেছিলেন: "আমি একদল অভিযান-উপযোগী সশস্ত্র মার্কিন বাহিনীকে মধ্য আফ্রিকায় আঞ্চলিক শক্তিগুলিকে সাহায্য করার দায়িত্ব দিয়েছি; ১২ তারিখে তারা উগান্ডায় পৌঁছে গেছে... পরবর্তীকালে উগান্ডা ছাড়াও দক্ষিণ সুদান, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক এবং কঙ্গোতেও তারা যাবে।" অর্থাৎ লিবিয়া পুরোপুরি দখল হবার আগেই মার্কিন শাসকশ্রেণী সুপরিকল্পিতভাবে তাদের আফ্রিকা অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল। হঠাৎ কেন এই আফ্রিকা-প্রীতি? তারও উত্তর মিলেছিল তথাকথিত দক্ষিণপন্থা-বিরোধী ওবামার এক চরম দক্ষিণপন্থী উপদেষ্টা পল ক্রেগ রবার্টস্-এর (রেগান জমানায় মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম প্রধান প্রবক্তা) মুখ থেকে : "*লিবিয়া বিজয় দিয়েই শুরু হতে চলেছে আফ্রিকার অন্যান্য দেশেও আমাদের অভিযান— যে যে দেশে চীন শক্তি ও খনিজ সেক্টরে বিনিয়োগ করছে, গড়ে তুলছে পরিকাঠামো, ঠিক ঠিক সেই সেই দেশেই এবার যাবে ওয়াশিংটনের বাহিনী ও বোমারু বিমান, এবং গড়ে উঠবে সামরিক ঘাঁটি।*"

ফলত ওবামা-বর্ণিত ওই চারটি আফ্রিকার দেশ সুনিশ্চিতভাবেই হয়ে উঠতে চলেছে আসন্ন সেই জায়মান ও অদৃশ্য মার্কিন হিমবাহের শুধু একটি অগ্রভাগমাত্র, যার মধ্যে দিয়ে তার সম্পূর্ণ ভয়াবহতা কিছুতেই প্রতিফলিত হবে না। বেশ কয়েক বছর ধরেই মার্কিন দেশ গড়ে তুলছে আফ্রিকার জন্য একটি বিশেষ সামরিক সংগঠন 'আফ্রিকম', যা যৌথভাবে কাজ করছে মধ্যপ্রাচ্যে একই উদ্দেশ্যে গঠিত সামরিক সংগঠন 'সেন্টকম'-এর সাথে পায়ে পা মিলিয়ে। এই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবেই জোরদার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে মালি, চাদ, নাইজার, বেনিন, বোৎসোয়ানা, ক্যামেরুন, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, ইথিওপিয়া, গ্যাবন, জাম্বিয়া, উগান্ডা, সেনেগাল, মোজাম্বিক, ঘানা, মালোয়াই ও মরিশেনিয়ার সামরিক বাহিনীকে। ন্যাটোভুক্ত অন্যান্য দেশের সাথে একসঙ্গে সামরিক মহড়া চলছে নাইজার ডেল্টা ও গিনি উপসাগরীয় অঞ্চলের 'শক্তি সরবরাহ সুরক্ষার' জন্য। লিবিয়া ছাড়া এই অঞ্চলের অন্যান্য উল্লেখ্যযোগ্য তেল উৎপাদনকারী দেশ হচ্ছে অ্যাঙ্গোলা, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, গ্যাবন, ইকুয়েডরীয় গিনি, চাদ ও মরিসেনিয়া। এই সব দেশেরই সুরক্ষার দায়িত্ব আজ হাতে তুলে নিতে চলেছে মার্কিন 'রক্ষাকর্তারা', যেখানে প্রয়োজনে সুনিশ্চিতভাবে কার্যকর হবে লিবিয়ারই মডেলে।

বস্তুত সাম্রাজ্যবাদের লিবিয়া আগ্রাসনই হতে চলেছে আফ্রিকার বিপুল প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের উপর তাদের একচ্ছত্র দখলদারির দিকে প্রথম পদসঞ্চার। অতি দ্রুত সুনিশ্চিতভাবেই আমরা দেখতে পাবো, আফ্রোকম-ন্যাটো যৌথ সামরিক কার্যক্রম — এই মহাদেশের কোণে কোণে নানা অজুহাতে নানা রঙের নানা 'বিদ্রোহ', 'মানবাধিকার'-সুরক্ষার লড়াই, সন্ত্রাস-বিরোধী যুদ্ধ— অনেকটা যেন ইরাক-আফগানিস্তান মডেলেই। সে সবের লক্ষ্য হবে সাম্রাজ্যবাদের একচ্ছত্র আধিপত্যের সাথে সাথে চীন যাতে সে দিক থেকে হাত সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়, সেটাও সুনিশ্চিত করা। চীন এখন তার প্রয়োজনীয় তেলের এক-তৃতীয়াংশই পায় আফ্রিকা— বিশেষত অ্যাঙ্গোলা ও সুদান থেকে। তাছাড়াও সংগ্রহ করে তার প্রয়োজনীয় প্ল্যাটিনাম, তামা, কাঠ ও লৌহ আকর। প্রাক্-অধিকৃত লিবিয়াতে কাজ করছিল ৭৫টি চীনা কোম্পানি ও অন্তত ৩৬ হাজার চীনা ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি— যতোটা না তেলক্ষেত্রে, তার চেয়েও অনেক বেশি পরিকাঠামো বিকাশের ক্ষেত্রে। আমেরিকা চায়, শুধু লিবিয়া নয়, সমগ্র আফ্রিকা থেকেই চীনের প্রস্থানকে সুনিশ্চিত করতে। সেই লক্ষ্যে তারা কতোটা সফল হবে, সেটা বলবে ভবিষ্যৎই। কেননা ক্রমহ্রাসমান শক্তিবিশিষ্ট বৃহৎ শক্তি হওয়া সত্ত্বেও একদিকে যেমন মার্কিনের রয়েছে অধৈর্য ঔদ্ধত্য ও বিশাল সামরিক শক্তি, ঠিক তেমনি চীনের রয়েছে বিশাল অর্থসম্ভার ও উদীয়মান বৃহৎ শক্তিসুলভ অসীম ধৈর্য। ফলত সংঘাত বাধবেই, ইতিমধ্যেই নানাভাবে যার ইঙ্গিত মিলতে শুরু করেছে।

এই পটভূমিকাতেই লিবিয়াতে গদ্দাফির বা তার আগে ইরাকে সাদ্দামের স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপের পর্যালোচনা করাটা আজ নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে; ঠিক যেমন হয়ে পড়ছে সিরিয়ার বাশার বা ইরানের আহমেদিনাজাদের স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতার আলোচনা। তাছাড়া এটা তো ঘটনা যে, মধ্যপ্রাচ্য বা আফ্রিকায় দীর্ঘদিনের মার্কিন-মিত্রদের— যেমন সৌদি আরবের বা আরব উপসাগরীয় অঞ্চলের কিংবা আফ্রিকার সমস্ত শাসকবর্গের— তুলনায় গদ্দাফি ছিলেন অনেক বেশি উদার ও জনকল্যাণকর, কিংবা সাদ্দাম ছিলেন অনেক বেশি মৌলবাদ-বিরোধী। বস্তুত এই দু'টি দেশই ছিল ওই অঞ্চলের সবচেয়ে বেশি জনকল্যাণমূলক (welfare) রাষ্ট্র। তাই স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতা বা হিংস্র মৌলবাদ তাদের বিরুদ্ধে মার্কিন জেহাদের কোনো ক্রমেই মূল কারণ ছিল না। অর্থাৎ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 'মানবাধিকার' সুরক্ষার স্বার্থে এই সব, বা আগামী দিনের সামরিক অভিযানগুলি বাস্তবত পরিচালিত হয়েছে বা হতে চলেছে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রগুলিকে ধ্বংস করার— বেসরকারিকরণ ও কর্পোরেটকরণের— লক্ষ্যেই। 'মানবাধিকার' সুরক্ষাই সত্যিকারের লক্ষ্য হলে তাদের অভিযান তো পরিচালিত হবার কথা সৌদি আরব বা ইজরায়েলের বিরুদ্ধেই। তার সামান্যতম লক্ষণ কি আজ পর্যন্ত ধরা পড়ছে?

আর নিরাপত্তা পরিষদের যে প্রস্তাব অনুসারে ন্যাটোর

'মানবিক' লিবিয়া অভিযানকে সবুজ বাতি দেখানো হয়েছিল, তার আড়ালেই কিন্তু নিহিত ছিল সব গোপন চুক্তি। সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট ন্যাশনাল ট্রানজিশনাল কাউন্সিল ফ্রান্সকে তাদের সমর্থনের 'বিনিময়ে' লিবিয়া অধিকৃত হলে সেখানকার তেলের ৩৫ শতাংশ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ফ্রান্স চোরের মা'র বড়ো গলায় তখন তা অস্বীকার করলেও, গদ্দাফি খুন হবার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফিলিপ হ্যামন্ডের কথায় তা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল, এবং হ্যামন্ড ব্রিটেনের সামনে লিবিয়ার তেল ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে ভাগ বসাবার সুবর্ণ সুযোগের কথা প্রকাশ্য বিবৃতিতে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। আর অধিকৃত লিবিয়ার রাজধানী বেনাগাজির মার্কিন দূতাবাসে মার্কিন পতাকা তুলবার সময় মার্কিন রাষ্ট্রদূত জেনে ক্রেজ প্রচণ্ড উল্লাসে জানিয়েছিলেন : ''আমরা জানি, লিবিয়ার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের 'মাথার মণি' (jewel in the crown) হচ্ছে তেল... মার্কিন কোম্পানিগুলি এখন বিরাটভাবে এখানে এসে সক্রিয় ভূমিকা নিলে— আমরা যে জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট থাকবো— এমনকি আমাদের দেশেই কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধে পাওয়া যাবে।'' সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির এই সোৎসাহ উল্লাসে যোগ দিয়েছিল ইতালিও। এবং লিবিয়ার বশংবদ নতুন সরকারও সেই সব উল্লাসধ্বনিতে প্রথম থেকেই যথাযথভাবে সাড়া দিয়েছে।

লিবিয়ার ৪৬ বিলিয়ন ব্যারেল তেলের সম্পদ তাকে আফ্রিকার সবচেয়ে বড়ো তেলের উৎস করে তুলেছে । তার দখল নিয়েই এখন ব্যস্ত সেদেশে 'মানবাধিকার' প্রতিষ্ঠাকারী 'পরোপকারী' বৃহৎ শক্তিগুলি। সেই ভবিতব্যই এখন অপেক্ষা করছে আফ্রিকার প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশগুলির জন্য। ইতিহাসে সম্ভবত গর্বের সঙ্গে উল্লেখিত থাকবে যে, সাম্রাজ্যবাদের সেই আফ্রিকা অভিযানে সর্বপ্রথম নেতৃত্বের দায়িত্বে ছিলেন সেই আফ্রিকারই এক কৃষ্ণাঙ্গ-বংশধর!

গদ্দাফির জমানায় লিবিয়াবাসী কেমন ছিলেন?

১। সবাই বিনা খরচে বিদ্যুৎ পেতেন।
২। সবাই বিনা সুদে ব্যাংক থেকে ঋণ পেতেন।
৩। নিজস্ব বাড়ি থাকাটা অধিকারের মধ্যে পড়ত। বিয়ে করলেই নবদম্পতিকে নিজেদের বাড়ি করার জন্য ৬০ হাজার দিনার (২৫ লক্ষ টাকা) অনুদান দেওয়া হতো রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে।
৪। চিকিৎসা ও শিক্ষা ছিল পুরোপুরি অবৈতনিক। গদ্দাফির আমলের আগে লিবিয়াতে সাক্ষরতার হার ছিল ২৫ শতাংশ। শেষে সেটা বেড়ে হয়েছিল ৮৩ শতাংশ। ২৫ শতাংশ লিবিয়াবাসী স্নাতক ছিলেন।
৫। চাষ করতে ইচ্ছুকরা চাষের জমি, কৃষি-ঘর, কৃষি-যন্ত্রপাতি, কৃষি-বীজ ও গবাদি পশু বিনা মূল্যে রাষ্ট্রের কাছ থেকে পেত।
৬। দেশে কারও দরকারমতো চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকলে বিদেশে তার চিকিৎসার খরচ তো রাষ্ট্র দিতই, উপরন্তু থাকা ও গাড়ি খরচ বাবদ দিত দেড় লক্ষ টাকা।
৭। কেউ গাড়ি কিনতে চাইলে অর্ধেক খরচ দিত রাষ্ট্র।
৮। পেট্রলের লিটার প্রতি দাম ছিল ৭ টাকা।
৯। লিবিয়ার কোনো বিদেশি ঋণ তো ছিলই না, তার উপর ছিল ১৫ হাজার কোটি টাকা বিদেশি মুদ্রা— যা মার্কিন প্রণোদিত ন্যাটো জোটের সামরিক আগ্রাসনের সময় বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।
১০। কেউ স্নাতক হবার পর যতদিন চাকরি না পেত, ততদিন চাকরিজীবীদের গড় আয় তাকে দেওয়া হতো।
১১। লিবিয়ায় পেট্রল বিক্রি থেকে রাষ্ট্রের আয়ের একটা অংশ প্রত্যেকের ব্যাংক-অ্যাকাউন্টে যুক্ত হতো।
১২। শিশুর জন্মের পর মা-কে ২.৫ লক্ষ টাকা অনুদান দেওয়া হতো।
১৩। ৪০টি রুটির দাম ছিল সাড়ে সাত টাকা।
১৪। কৃষিতে জলসেচের প্রয়োজনে করা হয় বিশ্বের মনুষ্যসৃষ্ট সবচেয়ে বড়ো সেচপ্রকল্প।

—অবশ্য গদ্দাফি তো ছিলেন একজন একনায়ক !

বিদ্যুতের চার্জ বৃদ্ধি ও একটি মিথ্যা গল্প

২৩ পৃষ্ঠায় পর

মেগাওয়াট। আর পিক আওয়ারে চাহিদা ৫ হাজার মেগাওয়াট। তাহা হইলে কেনই বা লোডশেডিং হইবে? রাজ্যের চাহিদা না মিটাইয়া ওই সময় বেশি দামে ভিন রাজ্যে বিদ্যুৎ বিক্রি করিয়া কোম্পানি মুনাফা লুটিতেছে। ১৬.৫ শতাংশের কম মুনাফা হইলে তাহাকে কি লোকসান বলে? ১৬.৫ শতাংশের যতটুকু পরিমাণ কম মুনাফা হইতেছে বণ্টন কোম্পানি বলিতেছে উহা তাহাদের প্রাপ্য। তাহাই আদায় করিবার জন্য বিদ্যুতের দাম বাড়াইতে হইবে। আর ইহাকে লোকসান বলা হইতেছে। কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম এই যুক্তি করিয়া আসিতেছে। বিদ্যুৎ ক্রমাগত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী, শিল্পপতি তথা মালিকশ্রেণীর জন্য এবং তাহাদিগের একচেটিয়া মুনাফার সামগ্রীতে রূপান্তরিত করা হইতেছে। সমস্ত সরকারই ইহাকে মদত দিতেছে। মালিকশ্রেণীর বন্দীদশা হইতে বিজ্ঞানের এই অবদানকে মুক্ত ও স্বাধীন করিয়া জনগণের ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়া দরকার। ইহার জন্য বর্তমান বিদ্যুৎ নীতির পরিবর্তন চাই।

পশ্চিমবঙ্গের সরকার নীরব থাকিয়া এমনভাব করিতেছেন যে তাহারা বিদ্যুতের চার্জ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে। ইহারাই হঠাৎ করিয়া বলিয়া বসিবেন কি বা করার আছে, বিদ্যুৎ কমিশন করিয়াছে। এই রাজ্যের মানুষ এইসব বামফ্রন্টীয় চালাকি আজ ভালই ধরিতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর উচিত সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এবং বিদ্যুৎ সংগঠন অ্যাবেকার প্রতিনিধিদের নিয়ে সঠিক বিদ্যুৎনীতি নির্ধারণ করা। এবং ইউনিট প্রতি ২ টাকা হারে বিদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া তা রূপায়ণ করা। রাজ্যের মানুষ মমতা ব্যানার্জীর নিকট এই প্রত্যাশাই করিতেছে।

ঝড় (খাগড়া, মুর্শিদাবাদ) ৭-১৩ নভেম্বর, ২০১১ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

পেট্রো-ডলার স্ক্যাম: ডলার-সংকটের নেপথ্য কাহিনী

আমরা কি জানি : ইরাক যুদ্ধ, লিবিয়া দখল এবং ইরান ও সিরিয়ার প্রতি আক্রমণের হুমকির প্রকৃত কারণ ?

—প্রকৃত কারণ কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্র নয়, সন্ত্রাসবাদ নয়, এমনকি নয় পেট্রল-ও।

—প্রকৃত কারণ হচ্ছে সাম্প্রতিক কালে দুনিয়ার সবচেয়ে বড়ো বুজরুকি : মার্কিন পেট্রো-ডলার স্ক্যাম।

- সেই ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতো কাগুজে নোট (Paper-note) ছাপাতো, তার সমান-মূল্যের সোনা তাদের ছিল না।
- কয়েক বছর পর ফ্রান্স সোনার অংকে তার হাতে জমে-যাওয়া কাগুজে-নোটের মূল্য দাবি করতেই ধরা পড়ে গেলো যে, মার্কিন দেশের সেই পরিমাণ সোনা হাতে নেই। ফলে সে বাধ্য হলো সেই দাবি অস্বীকার করতে এবং সেটাই কার্যত তাদের দেউলিয়া অবস্থার প্রমাণ দিল।
- উপায় না দেখে মার্কিন দেশ তখন শরণাপন্ন হলো সৌদি আরবের— চুক্তি হলো, এবার থেকে সৌদিরা শুধু ডলারের বিনিময়েই তেল বিক্রি করবে।
- তারপর থেকে সমস্ত দেশ তেল কেনার জন্য প্রথমে ডলার কিনতে বাধ্য হতো— যে ডলার মার্কিনিরা ছেপে দিলেই চলতো— সেই ডলারের দাম সোনার বিনিময়ে পরিশোধ করার ক্ষমতা আছে কিনা, সেটা আর দেখার বাধ্যবাধকতা থাকলো না।
- ফলত, তখন থেকে তারা কার্যত বিনা মূল্যেই অন্যদের কাছে তেল কিনত, তাকে শুধুমাত্র ডলার ছেপে দিলেই চলত। অর্থাৎ তারা অন্য দেশের পয়সায় নিজেদের খাবার পেয়ে যেতো।
- কিন্তু ইরাকের সাদ্দাম হোসেন সরাসরি ইউরো-র বিনিময়ে তেল বিক্রি করতে শুরু করতেই, এই মার্কিনি বুজরুকিটা ধরা পড়ে গেল— তেল-উৎপাদক দেশগুলির সাথে মার্কিনিদের বিশেষ বন্দোবস্তের দিন শেষ হয়ে এলো। তখন খোলা থাকলো একটাই পথ— সাদ্দামকে যেন-তেন-প্রকারেণ থামাতেই হবে !
- কিন্তু কীভাবে?
- মার্কিনিরা নিজেরাই, কিংবা অন্যদের কাজকে জেনে-শুনেও বাধা না দেবার ফলে, তাদের দেশের দু'টো টাওয়ার ধ্বংসের নাটক মঞ্চস্থ করলো; সাথে সাথে ইরাকে পরমাণু বোমা লুকোনো আছো বলে ডাহা মিথ্যে এক কাহিনী তৈরি করলো (পরে রাষ্ট্রসংঘের তদারকিতেও যা প্রমাণিত হয়ে গেছে), এবং সেই অজুহাতে ইরাক আক্রমণ ও দখল করলো লক্ষ লক্ষ ইরাকিদের প্রাণের দামে। তার পর প্রথমেই তারা আবার পুরোপুরি সেই ডলারের অংকে পেট্রল বিক্রির ব্যবস্থা চালু রাখলো। এভাবে সাময়িকভাবে তাদের সংকট প্রশমিত হলো।
- কিন্তু আবার মুস্কিল তৈরি করলেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো চ্যাভেজ, তিনি তেল বিক্রি করতে লাগলেন ডলার ছাড়া অন্য মুদ্রায়; তাই তাঁর জীবনের উপরেও কয়েকবার আক্রমণ চালানো হলো, এবং প্রমাণিত হলো তার মূল হোতা ছিল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ। ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়লো পেট্রো-ডলারের বিড়ালটা।
- ওদিকে দীর্ঘদিন ধরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দল পাকাচ্ছিলেন লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গদ্দাফি, ইঙ্গিত মিলছিল, তিনিও ডলার মুদ্রায় তেল কেনা-বেচা বন্ধ করে দিতে পারেন। এবার আরব অঞ্চলে মেরুঝড়ের যে জোয়ার বইতে শুরু করেছিল, তার আড়ালে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হলো তাঁর স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতার সুযোগ নিয়ে। ন্যাটো সামরিক জোটকে লেলিয়ে দিয়ে 'বিরোধী গণতান্ত্রিক জোট'-এর নাম করে সরাসরি সেদেশে আক্রমণ চললো, শেষ পর্যন্ত গদ্দাফিকেও নিকেশ করা সম্ভব হলো।
- এদিকে ইরানের প্রেসিডেন্টও বেগড়-বাই করতে শুরু করেছে, মার্কিনিদের বিপদে ফেলার জন্য ডলার ছাড়া অন্য মুদ্রায় তেল বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। ফলে সেদেশেও পরমাণু বোমার 'গন্ধ মিলতে' শুরু করেছে!
- ফলত মার্কিনিদের বুজরুকির খেলার দিন শেষ হয়ে আসছে— যখনই সব দেশ বুঝতে শুরু করবে যে, মার্কিন কাগুজে ডলার না জমিয়ে রেখে নিজের নিজের দেশের মুদ্রায় কেনা-বেচা করলেই তাদের সুবিধে বেশি, তখনই তারা ডলারকে বিদায় জানাবার জন্য প্রস্তুতি শুরু করবে।
- শেষ পর্যন্ত মার্কিনিদের পক্ষে এমন শোচনীয় অবস্থাও ঘনিয়ে আসতে পারে যে, তাদেরকে হয়তো কাগুজে-টাকা ছেপে দায়িত্ব শেষ করার বদলে ইউরো বা রুবলে বিদেশ থেকে তেল কিনতে হবে।
- তখনই ভেঙে পড়তে শুরু করবে মার্কিন সাম্রাজ্য, সূচনা হবে বিদেশে মার্কিন হানাদারির খরচ জোগাবার জন্য টাকা ঢেলে মার্কিন অর্থনীতিকেই বিপন্ন করে তোলার প্রক্রিয়ার অবসানের।
- অর্থাৎ বিরাট মার্কিনি পেট্রো-ডলারের বুজরুকিটা শেষ হয়ে এলো প্রায়। সেটা সত্যি সত্যি যখন হবে, তখন তাদের কিছুই করার থাকবে না— আর একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধানো ছাড়া।
- আর বেশি দিন নয়— সেই মুহূর্তটার আর মনে হয় আর খুব বেশি দিন দেরি নেই।

সূত্র: *ই-মেলে পাওয়া সচিত্র পোস্টার-প্রবন্ধ*

প্রবন্ধ

জইতাপুর, হরিপুর, কোদানকুলাম এবং কালাম

শুভাশিস মুখোপাধ্যায়

জাপানের মতো উন্নত প্রযুক্তির দেশে 'প্রাকৃতিক কারণে' নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনা ঘটার পর ভারত-সহ সারা পৃথিবীর নিউক্লিয়ার সাম্রাজ্যের অধীশ্বরবৃন্দ নড়েচড়ে বসেছেন। তাঁরা দিকে দিকে শান্তি, স্বস্তির ললিতবাণী শোনানোর সুঅভিপ্রায়ে তাঁদের দলের বিজ্ঞানী-আমলা, ব্যাঙ্কার ও ঘুষখোর-দুর্বৃত্ত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কলম হাতে এবং পুলিশ-গুন্ডা ও রাষ্ট্রশক্তিকে বন্দুক হাতে আসরে নামিয়ে দিয়েছেন। এই প্রেক্ষিতে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, পোখরান-হতে সামরিক পোযাক পরিহিত হাস্যমুখ প্রযুক্তিবিদ (নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী নন) এ পি জে আবদুল কালাম-এর নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ-এর পক্ষে সওয়াল বাড়তি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সত্য একটাই, কিন্তু মিথ্যার শেষ নেই। তাই বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক দিক থেকে ভুল, অপ্রাসঙ্গিক, বিপজ্জনক বিষয়কে বৈজ্ঞানিক এবং প্রয়োজনীয় বলে চালানোর রাজনৈতিক অপচেষ্টা গত পঞ্চাশ-যাট বছরে তার ধার এবং ঝাঁ-চকচকে অবয়বের অনেকটাই খুইয়ে বসেছে। বরং পুরোনো মিথ্যে-কথা, যা বারবার ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে, এখন তার পুনরাবৃত্তি ঘটছে। তাই সারা পৃথিবী জোড়া নিউক্লিয়ার-বিদ্যুৎ বিরোধী উদ্যোগে ভারতের আমজনতার ভূমিকা কী হবে, তা নিয়ে যেমন বিশ্বের ভুক্তভোগী জনগণ, তেমনি ভারতের নিউক্লিয়ার সাম্রাজ্যের কর্তাব্যক্তিরাও অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছেন।

নানা দিক থেকে মহারাষ্ট্রের জইতাপুর, পশ্চিমবঙ্গের হরিপুর এবং তামিলনাড়ু-র কোদানকুলম-এর আন্দোলন সারা বিশ্বের নজর কেড়েছে। প্রথমে আসি জইতাপুরের কাহিনীতে। এই আন্দোলনের এমন কতকগুলো বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছে, যা পূর্ববতী অনেক নিউক্লিয়ার-বিরোধী আন্দোলনে তেমনভাবে সামনে আসেনি। এই নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়তে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মদত ছিলো। সরকার অভূতপূর্ব সন্ত্রাস-এর আবহাওয়া সৃষ্টি করে। প্রাক্তন বিচারপতি-সহ বিশিষ্ট সামাজিক ব্যক্তিবর্গ এই প্রকল্পের বিরোধিতা করে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। এই আন্দোলন আগাগোড়া পুরোনো সমাজতন্ত্রীদের কল্পনায় যে 'অহিংস অসহযোগ'-এর ধারণা ছিলো, সেই ঘরানায় পরিচালিত হয়। ভারতে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা জারির পর সরকারি নীতির বিরোধিতার যে গণতান্ত্রিক বাতাবরণ বিরাজ করতো, তা আর আগের মতো থাকেনি। মহারাষ্ট্রে সেই কালা দিনগুলোর কুশীলববৃন্দ এবং ক্ষমতার শীর্ষে, যারা নিজেদের ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক স্বার্থে দাঙ্গা বাধায়, গরীব মুসলমানদের বাংলাদেশের 'গুপ্তচর' বলে রিয়েল এস্টেট-এর ব্যবসায় তাদের বাসস্থান দখল করে, এই প্রকল্পে তারাই সবচেয়ে বড় সমর্থক বনে যায়। অভাবনীয় অত্যাচারের পরও কিন্তু আন্দোলনের তীব্রতা কমেনি। আন্দোলনকারীরা মহারাষ্ট্রের অন্যত্র, তারাপুর নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রর নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে ভুক্তভোগী মানুষদের প্রকাশ্য সভায় আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁদের দুর্ভোগের অভিজ্ঞতা জইতাপুরের মানুষদের শুনিয়েছেন। জইতাপুরের আন্দোলনের ফলেই আরেভা সংস্থার নক্সার খুঁত সম্পর্কে আরও বিশদে জানা গেছে— ভারতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শুধু স্পেন বা চীন দেশই নয়, খোদ ফ্রান্স, যে দেশে আরেভা সংস্থা একচেটিয়া ব্যবসা চালায়, সেই দেশটিও তার দেশের আরেভা-প্রস্তাবিত নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য নতুন বেশ কিছু সুরক্ষা-সংক্রান্ত শর্তাবলী যোগ করেছে। জইতাপুরের আন্দোলনকারীদের উত্থাপিত অনেক কথাই এখন সরকার পক্ষের বোমারু-বিজ্ঞানী এবং আমলাবৃন্দ মানছেন। যেমন তাঁরা বলছেন যে বিকিরণের বিষয়টি এখন আর সমস্যার স্তরে নেই, এটাকে এখন সংকট হিসেবেই দেখতে হবে। যেমন বলছেন যে সুনামি বা ভূমিকম্প-র মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে 'সম্পূর্ণ সুরক্ষা' বর্তমান স্তরের প্রযুক্তির আয়ত্তাধীন বিষয় নয়, বস্তুত দ্বিতীয় প্রজন্ম-র (জইতাপুর বা কোদানকুলম নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র যার অন্তর্ভুক্ত) কোনও নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য এমন কোনও 'সুরক্ষা' যুক্ত করা যাবে না। মনে রাখতে হবে যে জইতাপুর ভূমিকম্প অঞ্চলে— আমরা যেন লাটুর-এর ভূমিকম্প-র কথা ভুলে না যাই। সে বামপন্থী পার্টিগুলি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন থাকার সুবাদে হরিপুর-এ পরমাণুকেন্দ্র গড়ার স্বপক্ষে জনমত নির্মাণে সবিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেছিলেন, যাঁরা মার্কিন দেশের সঙ্গে '১২৩ পরমাণু চুক্তি' ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলেও হরিপুর প্রকল্পের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন, তাঁরাই আবার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জইতাপুরের পরমাণু চুল্লির বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে রাস্তায় নেমেছেন। সিপিআইএম পার্টির সাংসদ শ্রীমতী সুভাষিণী আলি তথ্যানুসন্ধানী দল গঠন করেছেন, বিরোধী সাংসদ হিসেবে সিপিআইএম-এর বাসুদেব আচারিয়া রাষ্ট্রপতির কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার দলে ছিলেন। সাধারণ-ভাবে বলা যায় সমাজগণতন্ত্রী থেকে ঘোষিত সমাজতন্ত্রী চিন্তাধারার রাজনৈতিক দল, তাদের গণসংগঠন থেকে ব্যক্তি মানুষ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং নানা ধরনের সামাজিক সংগঠন, বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত দক্ষ প্রযুক্তিবিদ এবং কিছু নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানীরাও জইতাপুরে নিউক্লিয়ার চুল্লি স্থাপনের

বিষয়ে বিরূপতা প্রকাশ করেছেন। '৮০ বা '৯০ দশকের নিউক্লিয়ার শক্তি এবং চুল্লি বিরোধী আন্দোলন এবং সচেতনতা সে স্তরে ছিলো, বর্তমানে তার একটা গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন চোখে না পড়েই পারে না।

তামিলনাড়ু-র কোদানকুলম-এ রাশিয়ার সহায়তায় যে নিউক্লিয়ার চুল্লি বসতে চলেছে তার বিরুদ্ধেও জনমত সংগঠিত হয়েছে। এই আন্দোলনও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে হাজির করেছে, যা এযাবৎকালে সংগঠিত নিউক্লিয়ার চুল্লি-বিরোধী আন্দোলনে দেখা যায়নি। সাধারণ মানুষের যোগদান এখানে এতই বেশি যে ভারতের প্রধানমন্ত্রীও এই আন্দোলনকে উপেক্ষা করতে পারেননি। এই প্রথম ভারত সরকার নিউক্লিয়ার চুল্লি-বিরোধী আন্দোলনে ভাবা পরমাণু গবেষণাকেন্দ্রের প্রযুক্তিবিদের পরিবর্তে একজন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রীকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য পাঠায়। আন্দোলনের তীব্রতায় দূষণের পীঠস্থান এবং সরকারি দুর্নীতির আখড়া বলে খ্যাত তামিলনাড়ু সরকার আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে রাজ্যস্তরে সরকারিভাবে নিউক্লিয়ার চুল্লি বিরোধী প্রস্তাব নেয় এবং সেই প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠিয়ে আন্দোলনকারীদের দাবিকে কার্যত সমর্থন করে। এর আগে পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রে ভারতের পরমাণু মন্ত্রক রাজ্য সরকারগুলির প্রত্যক্ষ এবং উৎসাহী সহায়তায় রাজ্যে রাজ্যে পরমাণু চুল্লি বসানোর কাজ সম্পন্ন করেছে; সেই কেন্দ্র-রাজ্য সহায়তার মডেল এই প্রথম ব্যর্থ হতে চলেছে বলা যায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তারপরও পরমাণু চুল্লির পক্ষে ওকালতি করলেও তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী আন্দোলনকারীদের দাবির ন্যায্যতার প্রশ্নটি আবার সামনে আনেন।

কোদানকুলম-এর বিক্ষোভ আরও কয়েকটি বিষয়ে নতুন দিক উন্মোচিত করেছে। রাশিয়ার দেওয়া প্রযুক্তির খুঁতগুলো এখন প্রকাশ্যেই আলোচিত হচ্ছে এবং সেই খুঁতগুলো যে বর্তমান নক্সা বজায় রেখে মেরামত করা যাবে না, এ বিষয়ে রাশিয়ার প্রকাশ্য ঘোষণার পর আন্দোলন আরও বেশি শক্তি সঞ্চয় করেছে। ভারতের দক্ষ পরমাণু চুল্লি বিজ্ঞানীরা যে প্রযুক্তির পরমাণু চুল্লি চালাতে পারঙ্গম, রাশিয়ার দেওয়া চুল্লিটি সেই ধরনের প্রযুক্তির নয়। ফলে পরমাণু-বিজ্ঞানীদের এখন ভাবার সময় এসেছে যে এই বিশ্বায়নের যুগে তাঁরাও অচিরেই বাতিলের দলে পড়বেন! বস্তুত এই বিষয়টি অনুমান করেই অনেক নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী রাশিয়ান প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ঘরের মধ্যে কোন্দল সামলাতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আবদুল কালাম সাহেবকে কলম ধরতে হয়েছে মিথ্যার পসরা সাজিয়ে। কালাম সাহেবও বলেছেন যে নিউক্লিয়ার বিকিরণ বিপজ্জনক এবং রাশিয়ান প্রযুক্তি সর্বাংশে নির্ভরযোগ্য নয়। কালাম সাহেবকে মনে করিয়ে দিই তাঁর নিজের বইতে বর্ণনা করা ভারতের নিউক্লিয়ার সামাজ্যের নানান ভয়ানক দুর্যোগের কথা। যে রাশিয়ার প্রযুক্তির জয়গানে তিনি বর্তমানে মুখর সেই প্রযুক্তিই যে তাঁদের কেমন ভুগিয়েছে, তিনি তার চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর রচিত *Wings of Fire* বইতে, *অগ্নিপক্ষ* নামে তার একটি বাংলা অনুবাদও বেরিয়েছে। চের্নোবিল ঘটার পর পরই কোদানকুলম-এর চুল্লির বিরুদ্ধে বিরাট বিক্ষোভ হয়— কিন্তু রাজীব গান্ধী সরকার তখন নানা বাস্তব কারণে সেই বিক্ষোভ উপেক্ষা করে চুল্লি নির্মাণের প্রস্তুতি চালায়। ইতিমধ্যে ভারতেও ঘটে নারোরা, ঝাইগা, কাকরাপার-এর বিধ্বংসী দুর্ঘটনা; জানা যায় গুজরাতের রাওয়াতভাতা অঞ্চলে বিকিরণের ফলে ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা। অ্যাটমিক এনার্জি রেগুলেটরি বোর্ড-এর চেয়ারম্যান গোপালকৃষ্ণণ-এর বিভিন্ন লেখায় ভারতের নিউক্লিয়ার চুল্লিগুলোর সুরক্ষা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতার কথাও লোকে জানতে পারে।

২০০৪-এর দক্ষিণ ভারতে সুনামি ঘটলে ভারতের দক্ষিণ উপকূলের বাসিন্দারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারেন যে ভারত সরকারের বিপর্যয় মোকাবেলার ব্যবস্থা কতটা আদিম। সাত বছর হতে চললো আজও সেই বিপর্যয়ের শিকার মানুষদের এক বড় অংশই ত্রাণ-এর নির্ভর করে বেঁচে আছেন। এরপর যখন জাপানে ফুকুসিমার ঘটনা ঘটলো, তখন মানুষ বুঝলেন যে এই জাতীয় দুর্ঘটনা-জনিত বিপর্যয় সামলানোর বিষয়টি বর্তমান প্রযুক্তির সাধ্যের অতীত। ফলে বিক্ষোভ দানা বেঁধে প্রায় বিদ্রোহের রূপ নিচ্ছে। যত দিন যাবে ততই নিউক্লিয়ার চুল্লি বিরোধীদের যুক্তি এবং তথ্য মানুষের কাছে বেশি করে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে বস্তুত জইতাপুর এবং কোদানকুলম সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে।

মানুষ তার অভিজ্ঞতা থেকে একটা সার কথা বুঝে গেছেন— নিউক্লিয়ার চুল্লির দুর্ঘটনা, নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণের চেয়ে মাত্রার দিক থেকে অনেক বেশি বিপজ্জনক। নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণের পরে ৬৬ বছর কেটে গেছে— নাগাসাকি এবং হিরোসিমা এখন ঝাঁ-চকচকে আধুনিক শহর। যদিও এখনও সেখানে বিকিরণের প্রভাবে বিকলাঙ্গ মানব শিশু জন্ম নিচ্ছে, কিন্তু মানুষ সেখানে নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি নিয়ে আস্তানা গাড়ছে। চের্নোবিল নিউক্লিয়ার চুল্লির দুর্ঘটনার পর ২৫ বছর কেটে গেছে— মানুষ সেখানে বাসা বাঁধতে পারবে আরও ৭৫ বছর পর। চের্নোবিল, থ্রি মাইল আইল্যান্ড এবং ফুকুসিমা-র নিউক্লিয়ার বর্জ্য যাঁরা ঝুঁকি নিয়ে পরিষ্কারের দায় গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই মৃত— বাকিরা মৃত্যু-পথযাত্রী। এই সম্পূর্ণ পরিহার্য মৃত্যুর দায় কি নিউক্লিয়ার সাম্রাজ্যের অধিকর্তারা গ্রহণ করবেন, নাকি তাঁরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলবেন, "গিয়াছে কতক পর্ণ কুটির / কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর / কত ধন যায় রাজ মহিষীর এক প্রহরের প্রমোদে"?

প্রবন্ধ

শিক্ষা অর্ডিন্যান্স

সলিল বিশ্বাস

অর্ডিন্যান্স বা অধ্যাদেশ প্রকৃতিগতভাবেই অগণতান্ত্রিক, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির অবর্তমানে। এই ধরনের ফরমান সাধারণভাবে আধিপত্যবাদের প্রকাশ। তেমন কোন জরুরি অবস্থার কথা বাদ দিলে যে কোন অধ্যাদেশই আপত্তিকর।

একথা অনস্বীকার্য যে, পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এবং উচ্চশিক্ষা সামগ্রিকভাবে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পড়ে আছে। এই অবস্থার উন্নয়ন কোন অধ্যাদেশ বা তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সম্ভব হবে না। গত ছ'মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার বলে আসছেন যে, ১৯৭৭ থেকে চালু 'অগণতান্ত্রিক পার্টিবাজি' পঃ বঙ্গের সবকিছুকেই খোঁড়া করে রেখেছে এবং অবস্থার উন্নতি হতে সময় লাগবে। একথাকে যদি আমরা সত্যি বলে মেনে নিই তাহলেও বলতে হবে যে আর দু'চার মাস অপেক্ষা করলে যে জাহাজের পালে হাওয়া এমনিতেই ছিল না, তার সলিল সমাধি ঘটত না। কী এমন ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়ে গেল ইতিমধ্যে যে একজন মাননীয় মন্ত্রীকে তড়িঘড়ি এমন একটি বিচিত্র অধ্যাদেশ মন্ত্রীসভার সামনে তুলে সেটিকে পাশ করিয়ে নিতে হলো? মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কি সেখানে উপস্থিত ছিলেন? আবার যদি ধরে নিই এক্ষুণি এটার খুব দরকার ছিল তাহলে এখন বলা, হচ্ছে কেন যে আসলে এই দলিলটিতে কিছু গোলমাল আছে এবং সেগুলো শুধরানো দরকার। খবরের কাগজে এখন বলা হচ্ছে শিক্ষাকর্মীদেরই পরিচালন সমিতি-গুলিতে নেওয়া বোধ হয় বাঞ্ছনীয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন (১৯৭৯)-এর ৫২ নং ধারায় বলা আছে যে অধ্যাদেশ কখনো কখনো জারি করা যেতে পারে। সেগুলো রচনা করবে সিনেট এবং তা হবে আচার্য অথবা রাজ্যপালের অনুমোদন সাপেক্ষ। ৫৩ নং ধারায় অধ্যাদেশ জারি করার নিয়মকানুন বিস্তারিতভাবে বলা আছে। এই দুটি ধারা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় আইন (সংশোধনী) অধ্যাদেশ ২০১১ (৩নং) প্রণীত হয় নি। অবশ্য, তা না হবারই কথা। কারণ এই অধ্যাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় আইনকেই ফেলে দিয়ে নতুন কোন বিচিত্র আইন প্রণয়ন করতে চলেছে। এটি একটি সরকারি আদেশনামা যা মন্ত্রীসভার মস্তিষ্ক প্রসূত, যা এখনও আইনসভার ধারে কাছে যায় নি।

এই অধ্যাদেশের ঘোষিত উদ্দেশ্য হলো দলতন্ত্রের অবসান ঘটানো এবং গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই অধ্যাদেশ যা করতে চলেছে তা হলো দল-নির্ধারিত আমলাতন্ত্রের সার্বিক প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য বহু শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগীদের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এই ফরমান একটি সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য পদক্ষেপ এবং এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অবশিষ্ট আত্মনিয়ন্ত্রণ থেকেও বঞ্চিত হবে এবং মুমূর্ষ উচ্চশিক্ষার কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতা হয়ে যাবে। এই আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করে প্রকৃত গণতান্ত্রিক এবং সাংবিধানিক রীতিনীতি মেনে বিশ্ববিদ্যালয় আইনকে প্রয়োজনে সংশোধন করতে হবে।

ইতিমধ্যেই বহু শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, শিক্ষানুরাগী মানুষ, বিভিন্ন গণসংগঠন এই অধ্যাদেশ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। এমনকি উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত উপদেষ্টা কমিটির সদস্যরাও এই অধ্যাদেশের পক্ষে নন। শিক্ষা জগতের বিভিন্ন অংশ এই অধ্যাদেশের বিরোধিতা করছেন এবং আগামীদিনে আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে চলেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, শিক্ষাকর্মীদের বিভিন্ন সংগঠন, ছাত্রদের বিভিন্ন সংগঠন। ভারতের ছাত্র ফেডারেশনও আন্দোলনে নামাবার কথা ঘোষণা করেছে। এমনকি তৃণমূল ছাত্র পরিষদও— খুব সোচ্চারে না হলেও— প্রতিবাদ করছে।

এই বিরোধ সর্বতোভাবে সমর্থনযোগ্য। অবশ্য এই বিরোধী দলের মধ্যে এমন কিছু মানুষও আছেন যাঁদের ক্ষমতা, লোভ, দুর্নীতি ও অবিমৃষ্যকারিতা বামপন্থাকে মসীলিপ্ত করেছে। বস্তুত, আজকের পরিস্থিতির জন্য তাঁরাই সর্বাংশে দায়ী।

শাসকদল, কিছু কিছু খবর-শকুন এবং ওয়েবকুটার ভিতরে শাসকদল সমর্থিত 'ডেমোক্রেটিক টিচার্স ফর অটোনমি অ্যান্ড অ্যাকডেমিক ফ্রিডম'— এই অধ্যাদেশের সমর্থনে সোচ্চার হচ্ছেন। তাঁদের একবারও মনে হচ্ছে না যে, এই অধ্যাদেশ পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চলেছে এবং শিক্ষাকে পুরোপুরি কোন একটি দলের কুক্ষিগত করে ফেলতে চাইছে।

আজকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সবকিছুতেই ধীরে চলার নীতি নিয়েছেন, আবার কিছু কিছু জিনিস খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলতে চাইছেন। সম্প্রতি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 'রাক্ষসবধ' সম্পন্ন হয়েছে। ফলে অন্য সব দিক থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে নেবার মস্তবড় সুযোগ এসেছে। আপাতত বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে বড় একটা কেউ ভাবছে না। ইতিমধ্যেই এই অধ্যাদেশের প্রয়োগের চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে। শিক্ষামন্ত্রকের ধমক উপেক্ষা করায় বরখাস্ত হতে চলেছেন একজন উপাচার্য, কিছু হাস্যকর অভিযোগের ভিত্তিতে। একটা উদ্ভট কথা বলি। দু'এক সপ্তাহ আগে দক্ষিণ কলকাতার সিটি কলেজে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ

শিক্ষাকর্মীদের একটি সম্মেলন হচ্ছিল তৃণমূল অধ্যুষিত সংগঠনের পতাকাতলে। সেখানে উপস্থিত শিক্ষাকর্মীরা দলমত নির্বিশেষে শিক্ষামন্ত্রীকে নানা দাবিদাওয়া সম্পর্কে চেপে ধরেছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী শুনেছি উষ্মা প্রকাশ না করে পারেন নি। নিমন্ত্রিত অতিথিকে, তিনি যেই হন না কেন, হেনস্থা করা উচিত নয়। কিন্তু শিক্ষাকর্মীদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভকে উপেক্ষা করা যায় কী করে?

অপ-উন্নয়নের বিরুদ্ধে শিক্ষক ও বৈজ্ঞানিকদের সংগঠন 'টাসাম' স্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে, এই অধ্যাদেশ শিক্ষা সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং এর দ্বারা দলতন্ত্রের বদলে আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে। তারা এও বলেছে যে, এই অধ্যাদেশ যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এই অধ্যাদেশ সংবিধান প্রদত্ত ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করছে। ছাত্র ও শিক্ষাকর্মীদের পরিচালন সমিতিগুলি থেকে বাদ দেওয়ায়ও তারা নিন্দা করেছে।

নিয়ন্ত্রণ আর হস্তক্ষেপ অনেক দেখেছি। তা ছিলো জনতোষণ এবং গা-জোয়ারির মারাত্মক সংমিশ্রণ। দেখেছি সরকারি নিয়ন্ত্রণ, দলীয় হস্তক্ষেপ, মধ্য-মেধা, নিম্ন-মেধা এবং মেধাহীনতার পৃষ্ঠপোষণের "অনিলায়িত" রূপ। নতুন সরকার আসার পরে অনেকের মনে বেশ কিছু প্রত্যাশা জেগেছিল। কিন্তু এই অধ্যাদেশ সমস্ত আশায় জল ঢেলে দিয়েছে।

অত্যন্ত গোপনীয়তা ও দ্রুততার সঙ্গে এই অধ্যাদেশ রচিত হয়ে মন্ত্রীসভা থেকে অনুমোদন নিয়ে রাজ্যপালের স্বাক্ষর সম্বলিত হয়ে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এ বিষয়ে কিছু জানতে পারেন নি, শিক্ষাজগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত সমস্ত মানুষ যারা এই অধ্যাদেশ দ্বারা সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তারাও কিছু জানলেন না। বর্তমান উপাচার্যরা এবং বিভিন্ন পরিচালন সমিতিগুলি এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র অবহিত ছিলেন কিনা জানা নেই।

সমগ্র অধ্যাদেশটির প্রতিটি শব্দ পরীক্ষা করে অনুপুঙ্খ সমালোচনা করা দরকার। হতে পারে যে গোটা বিশ্ববিদ্যালয় আইনটিকেই ঢেলে সাজানো দরকার। কিন্তু যে স্বৈরতন্ত্র এই অধ্যাদেশে মুখ মেলেছে এবং সমস্ত বিপক্ষ মতকে পদদলিত করতে চাইছে তার দ্বারা কোন ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব নয়।

এখানে আমরা কয়েকটি মূল আপত্তির জায়গাকে চিহ্নিত করতে চাইছি। আমাদের মনে হয়েছে এইসব ধারাগুলি গণতান্ত্রিক ভাবধারাকে শিক্ষার অঙ্গন থেকে বিতাড়িত করতে চাইছে।

প্রথমে দেখা যাক সিনেট ও সিন্ডিকেটের চেহারা কী দাঁড়াতে যাচ্ছে। অন্যান্য পরিচালনা সমিতির ধারাগুলোও একই রকম। আলাদা করে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে না।

যে কোনো পরিচালন সমিতি নিয়ে নতুন ধারা প্রণীত হলে সেই সমিতি কীভাবে গঠিত সে কথা প্রথমেই বলে নেওয়া বিধেয়। এখানে তেমন কিছু উল্লেখ না করে এবং মনোনয়নের ব্যাপারে স্পষ্ট করে যে কথা বলে দেওয়া হয়েছে সেটাই প্রধান এবং প্রথম আপত্তির জায়গা। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে নির্বাচন বস্তুটিকে বিষবৎ পরিত্যাগ করা হয়েছে। পরিচালন সমিতিগুলিকে (সিনেট, সিন্ডিকেট কোর্ট, ইউ জি কাউন্সিল, পি জি কাউন্সিল) এখন থেকে আর নির্বাচন করা হবে না, মনোনয়ন করা হবে। একদিকে বলা হচ্ছে পরিচালন সমিতিগুলিতে 'জনপ্রতিনিধিদের' উপস্থিতি রদ করা হবে। অন্যদিকে বৃহৎ সংখ্যায় মনোনীত সদস্য দিয়ে সমিতিগুলিকে ভরাট করার ব্যবস্থাও পাকা করা হচ্ছে। এর ফলে নাকি উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত হয়ে যাবে। উল্লেখই করা হয় নি, এই মনোনীত সদস্যরা রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবেন, নাকি পারবেন না।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ধ্বনি তুলে। গণতন্ত্র নাকি তাঁদের একমাত্র মন্ত্র। তাহলে বহু-পরীক্ষিত একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে তুলে দেবার চেষ্টা কেন? তা কোন্ মানসিকতাকে চিহ্নিত করে? একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে নির্বাচন সবসময়ই মনোনয়নের থেকে গণতান্ত্রিক। পূর্বতন সরকার নির্বাচন ব্যবস্থাকে দলতন্ত্র দিয়ে বিকৃত করেছিল ক্ষমতার স্বার্থে। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সুস্থ করে না তুলে তাকে বর্জন করা যে মনোভাবের পরিচয় দেয় তাকে স্বৈরতান্ত্রিক বলা হবে, না 'ফ্যাসিস্ট'— বলা হবে সেটা পাঠক ঠিক করুন। নির্বাচন মানেই যে রিগিং নয় বর্তমান সরকার সেটা ভালো করেই জানেন। বিশেষ করে যখন নির্বাচন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ তাঁদেরই হাতে থাকবে। এই মনোনয়নের ক্ষমতা কাদের হাতে অর্পিত হতে চলেছে সে কথা এখনও জানা নেই। আপাতত সবই চালানো হচ্ছে রাজ্যপালের নামে, যে রাজ্যপাল সরকারি পরামর্শ ছাড়া এক পাও চলতে পারেন না। কিছু ব্যক্তির (তাঁরা যতই নিরপেক্ষ বা মেধাবী বা শিক্ষাদরদী বা দক্ষ বা সদিচ্ছা-সম্পন্ন হোন না কেন) ইচ্ছা এবং পছন্দের উপরে শিক্ষা নিয়ন্ত্রকদের নিয়োগ ছেড়ে দিতে আমি অন্তত রাজি নই। লঙ্কা এবং রাবণ সম্পর্কে প্রবাদটি আমাদের মনে সর্বদাই জ্বলজ্বল করে। আর সদিচ্ছা? একটি ইংরেজি প্রবাদ তর্জমা করে বলছি— নরকের পথ বাঁধানো থাকে সদিচ্ছা দিয়ে!

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনসমিতিগুলিতে শিক্ষাকর্মীদের এবং ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব আর থাকবে না। ছাত্ররা পড়াশুনা করবে। বড়দের বিশেষ করে শিক্ষকদের ব্যাপারে তাদের নাক গলাবার দরকার কি? তাছাড়া এদের দিয়েই তো রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আনার চেষ্টা হয়। আর শিক্ষাকর্মীরা অফিসে কাজ করবেন। তাঁদেরও প্রতিনিধিত্ব আর থাকবে না।

একটি বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ বা স্কুল চলতে পারে শিক্ষক-ছাত্র-শিক্ষাকর্মীদের সঠিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে। এই বোঝাপড়া নষ্ট হয়ে গেছে। বলা ভালো, নষ্ট করা হয়েছে।

ছাত্র এবং শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধিত্বের ফলে অনেক সমস্যা দেখা দেয় একথা ঠিক। সমস্যা থাকে অনেক। গায়ের জোর ফলানোর চেষ্টা থাকে। ছাত্র সংসদগুলিতে নোংরা রাজনীতি, ব্যক্তিগত ও দলীয় রেষারেষি থাকে। ফলে অনেকে বলেন, ছাত্র সংসদ বা শিক্ষাকর্মীদের কোন সমিতি না থাকা উচিত। এই কথাটি কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নয়। এখন যাঁরা শিক্ষাকর্মীদের বা ছাত্রদের প্রতিনিধি বলে নিজেদের দাবি করেন তাঁরা আদৌ সত্যি সত্যি প্রতিনিধিত্ব করেন কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ আছে। সমস্ত কলেজগুলিতে ছাত্র সংসদগুলির নির্বাচন আসন্ন। এই প্রক্রিয়া কী মারাত্মক রূপ নেয় সেটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুক্ত সব ব্যক্তি জানেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে নির্বাচন বন্ধ করে দিতে হবে। প্রকৃত ছাত্র প্রতিনিধি কেমন করে নির্বাচন করা যায় সে বিষয়ে অনেকেরই অনেক রকম ভাবনা আছে।

এবার উপাচার্য নিয়োগের কথায় আসা যাক।

> এখন থেকে উপাচার্যরা মনোনীত হবেন আচার্যের দ্বারা। রাজ্যপালের প্রতিনিধি, ইউজিসি-র একজন প্রতিনিধি এবং সিনেটের একজন প্রতিনিধি মিলে তৈরি হবে একটি সরকারি সার্চ কমিটি, যারা উপাচার্যকে মনোনীত করবেন। এই কমিটির কেউ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না। সিনেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত নন এমন সকলেই সরকার মনোনীত। সুতরাং 'সার্চ কমিটি'তে সিনেটের প্রতিনিধিত্ব করবেন সরকারি মানুষ। রাজ্যপালের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য উপযুক্ত কারা হবেন সেটা বলা নেই।
>
> উপাচার্যদের সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক হতে হবে। তাঁকে এমন এক ব্যক্তি হতে হবে যাঁর সঙ্গে কোন রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ থাকবে না। যদি কখনও জানা যায় যে, কোন দলের সঙ্গে কোন যোগাযোগ তাঁর কোনদিন ছিল তাহলে তাঁকে বরখাস্ত করা হবে। অবশ্য তাঁকে একবার আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগও দেওয়া হবে।

রবি ঠাকুর বেঁচে থাকলে তিনি কোনমতেই কোথাও উপাচার্য হতে পারতেন না। এমনকি বিশ্বভারতীতেও না। কোন মতে ফস্কে যদি হয়েও যেতেন, তার কপালে ছাঁটাই ছিল অনিবার্য।

'অরাজনৈতিক' ব্যক্তি? এরকম কোন প্রাণী আছে কোথাও? যদি ধরে নেওয়া যায় আছে, তাহলে তিনি যত জ্ঞানীগুণী বিশিষ্ট হন না কেন, তাঁর নামের পিছনে যতটা অক্ষরই বসানো থাকুক না কেন, তিনি কখনই উপাচার্য হবার যোগ্য হবেন না। এই ধরনের সিদ্ধান্তের পিছনে গোপন অভিসন্ধি যে আছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যদি কাউকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয় তাহলে তাঁর সাংবিধানিক অধিকারে অবশ্যই হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। কোন দিন তিনি রাজনীতির সঙ্গে সামান্যতম যুক্ত থাকলেও তাঁকে বরখাস্ত হতে হবে, এর চাইতে অপমানজনক শর্ত আর কী হতে পারে? কেউ বলতে পারেন, কোন ব্যক্তির যদি এই শর্ত মেনে নিতে আপত্তি না থাকে তাহলে কার কী? সত্যি কথা। এমন লোকের অভাব হবে না। কিন্তু তাঁরা আদপেই অরাজনৈতিক হবেন না। তাঁদের রাজনীতি বরং আরো বিপজ্জনক।

'রাজনৈতিক দল' শব্দবন্ধটির এক সাংবিধানিক এবং আইনি সংজ্ঞা আছে। তাহলে রাজ্যপালকে এই অতিসাংবিধানিক অধিকার দেওয়া হচ্ছে কেন?

এতদিন উপাচার্যকে অপসারণ করার কোন ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে ছিল না। অধ্যাদেশে এই অপসারণের ব্যবস্থা সবিস্তারে করা হয়েছে। বিভিন্ন শর্তাবলীর মধ্যে প্রধান শর্তটি হলো ওই রাজনীতি সংক্রান্ত।

এই একটি বিষয় খানিকটা হলেও মেনে নেওয়া যায়। 'রাইট টু রিকল'— ফিরিয়ে নেবার অধিকার, গণতন্ত্রে থাকাই উচিত। কিন্তু ফিরিয়ে নেওয়া হবে কোন্ কারণে, তার উপরে নির্ভর করবে এই ধারার যৌক্তিকতা। একটা কথা বলা আছে। উপাচার্য যদি ঠিকমতো কাজ না করেন তাহলে তাঁকে সরে যেতে হবে। 'ঠিকমতো কাজ' কথাটির অর্থ কী? কে স্থির করবে কাজ ঠিকমতো হচ্ছে কিনা।

> সহ-উপাচার্যকে নিয়োগ করবেন উপাচার্য নিজে, উচ্চ-শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে।

উপাচার্য কেন একা নিয়োগকর্তা হবেন, বোঝা গেল না। বোঝা গেল না, মন্ত্রীর সঙ্গে কেন আলোচনা করতে হবে। এক তো এতে উপাচার্যের যথেষ্ট অবমাননা করা হলো। 'অরাজনৈতিক' উপাচার্য মন্ত্রীর সঙ্গে কতটা পেরে উঠবেন তা সহজেই অনুমেয়।

একটা প্রশ্ন মনে আসেই। অরাজনৈতিক ও দলনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের কি শিক্ষামন্ত্রী পদে বহাল করা হয়? বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী হয়ত শিক্ষার স্বার্থ ছাড়া কিছুই ভাববেন না। কিন্তু আগামী দিনে যারা শিক্ষামন্ত্রী হবেন তাঁরা সকলেই কি শিক্ষানুরাগী হবেনই? অতীতে যাঁরা শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তাঁদের কার্যকলাপ এবং রাজনীতিবিদদের কার্যপ্রণালী ও মনোভাব দেখলে আদপেই কি মনে হয় যে তাঁরা এমন একজন সহ-উপাচার্য নিয়োগ করতে উপদেশ দেবেন যিনি ধামা-ধরা হবেন না? এভাবে কি দলতন্ত্রকে হটানো যাবে?

এই অধ্যাদেশের আরও অনেক কিছু কথা আছে। গোটা অধ্যাদেশ জুড়ে দেখা যাচ্ছে শিক্ষকদের প্রান্তিকীকরণ, সমস্ত মনোনয়নে

আমলাদের এবং বকলমে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের একচ্ছত্র আধিপত্য এবং গোটা উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ আমলাতান্ত্রিক তথা সরকারি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার চেষ্টা সুস্পষ্ট। এখানে মূলত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাই বলা হলো। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে তৃতীয় অধ্যায়ে পরিচালন সমিতিগুলির হাতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ সব বিষয়ে সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির উপরে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া আছে। এই ব্যাপক অধিকার যে কোন রাজনৈতিক দলের হাতে তুলে দেওয়ার ফলাফল যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে সে বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে।

সমাজের সর্বাধিক প্রভাবশালী গোষ্ঠী বিদ্যালয়-ব্যবস্থা পরিচালন করে। ইতিহাসের যে কোন সময়ে যে রাজনৈতিক শক্তি অথবা দল সরকারি ক্ষমতায় থাকে তাদের কাজের পদ্ধতিই সেখানে প্রতিফলিত হয়। তাদের দার্শনিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক চিন্তা সেখানে ফুটে ওঠে। বিদ্যালয়-ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। বিদ্যালয়-ব্যবস্থা যেহেতু সমাজের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানগুলির একটা এবং মানুষের মনকে প্রভাবিত করতে সবচাইতে সক্ষম এবং এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা, নিরপেক্ষ চরিত্র ও পবিত্রতা সম্পর্কে মানুষের মনে ভ্রান্ত ধারণা থাকে সব চাইতে বেশি, সেহেতু সব সময়েই চেষ্টা থাকে এই ব্যবস্থার উপর গভীরতম কর্তৃত্ব স্থাপন করার। কিন্তু সমাজের সর্বাধিক 'প্রভাবশালী গোষ্ঠী' কারা? রাজনৈতিক দলগুলি? না, তারা যাই দাবি করুক না কেন। বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল (বর্তমান চেহারার সিপিএম-কে নিয়ে) বৃহৎ ব্যবসা ও দেশি-বিদেশি পুঁজির প্রতিনিধিত্ব করে এবং তাদের স্বার্থে নয়া উদারনৈতিক ব্যবস্থা চালু করতে সচেষ্ট হয়, যে ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদকে তার ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা থেকে তুলে আনার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন এলাকায় নিজেদের দায়িত্ব সম্প্রসার করার নানারকম চেষ্টা চালায়। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন শিক্ষানীতিকে হস্তগত করার পরে পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা ভারতের উচ্চ শিক্ষায় বিনিয়োগ এবং নিয়ন্ত্রণ চালু করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এই অধ্যাদেশ সেই বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার অভিমুখে একটি ধাপ বলে মনে হয়। পূর্বতন সরকার খানিকটা হলেও মুখোশের আড়ালে ছিল। বর্তমান সরকারের হাতে আর সময় নেই। প্রভুদের আদেশ অমান্য করলে বা ঠিকমতো পালন করতে না পারলে কী হয় সেই শিক্ষা পরাজিত বামফ্রন্ট তাদের দিয়ে গেছে।

দলতন্ত্র বর্জনের কয়েকটি নমুনা আপনাদের শোনাই।

কয়েকমাস আগে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সেমিনারে এক বক্তা মার্কস এবং এঙ্গেলসের কথা উল্লেখ করেছিলেন। লাল দেখে কয়েকজন তৃণমূল সমর্থক রে রে করে তাঁকে তেড়ে যায় এবং বক্তৃতা বন্ধ করে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ বার্ষিকীতে স্থানীয় একজন প্রতিনিধি উপাচার্যের উপস্থিতিতে ঘোষণা করেন যে কিছু সংখ্যক শিক্ষক এবং ছাত্রকে তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে দেবেন না। এখন থেকে তো আবার উপাচার্য ছাঁটাই হবার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকবেন।

বিভিন্ন স্কুল কমিটির নির্বাচনে শোনা যাচ্ছে ভীতিপ্রদর্শন সহকারে ছাপ্পা ভোট মেরে দলীয় বিজয়কে সুরক্ষিত করা হচ্ছে। ছাত্র ইউনিয়নগুলিতে যথারীতি ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের পেশী প্রদর্শন চলছে। আগে যেমন চলত।

বিভিন্ন কলেজ পরিচালন-সমিতিগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী অনুসারেই বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বিরাজ করছেন। রাজনীতিবিদ হিসাবে তাঁরা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দক্ষ ও খ্যাতিমান। কিন্তু, আমাকে ক্ষমা করবেন, কলেজ পরিচালনা, পঠনপাঠন এই সমস্ত বিষয়ে তাঁদের কতটা জ্ঞাত আছে সে বিষয়ে আমি অত্যন্ত সন্দিহান। তারা নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন করবেন না, বা অধিকারের বাইরে পা রাখবেন না— এই রকম দিবা-স্বপ্ন আমি দেখি না। শিক্ষামন্ত্রী টিভিতে বলেছেন, এমন কোন ব্যক্তি কলেজের ব্যাপারে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করলে তাকে অপসারণ করা হবে। তাঁর কথায় আস্থা রেখে অপেক্ষা করে দেখা যাক ভবিষ্যতে কী হয়।

৭ *লেখক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক*

একটি বিনীত প্রশ্ন

সম্প্রতি মহামান্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাহাদুর বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারি করে এই রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে কিছুগুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করেছেন।

সেই অর্ডিন্যান্স-এর 2(2) (i) (b) ধারা অনুসারে দুই ধরনের মানুষ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হতে পারবেন না:

(i) যারা কোনো আদালত কর্তৃক দণ্ডিত, এবং

(ii) যারা কোনো রাজনৈতিক দলের রাজনৈতিক দলের সদস্য, বা অন্য কোনোভাবে কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত।

আমার বিনীত প্রশ্ন: আদালত কর্তৃক দণ্ডিতরা এবং রাজনৈতিক দলের সদস্য, বা অন্য কোনোভাবে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা কি সমগোত্রীয়?

ভারতীয় সংবিধান কি একথা স্বীকার করে ?

নমস্কার জানবেন।

সহস্রলোচন শর্মা

প্রবন্ধ

বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স : কিছু ভাবনা

দেবর্ষি চক্রবর্তী

যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ

মধুচন্দ্রিমা শেষ। বাংলার সংগ্রামী জনগণের সাথে মমতা ব্যানার্জী সরকারের সখ্যতার দিন ফুরিয়ে এল। যদি ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেসের ইস্তেহারটি কেউ দেখেন এবং গত ৬ মাসে এই সরকারের কাজের পর্যালোচনা করেন তবে বেকুব বনে যাবেন। জঙ্গলমহল থেকে যৌথ বাহিনী প্রত্যাহার, বন্দীমুক্তি, সিঙ্গুরে টাটার চুক্তি প্রকাশ এরকম হাজারো প্রতিশ্রুতি শুনিয়ে ক্ষমতায় এল ঘাসফুল সরকার আর আজ- সিঙ্গুরে চাষিদের জমি আটকে, টাটার চুক্তি প্রকাশ করা হল না, একজন রাজনৈতিক বন্দিও মুক্তি পেলেন না, যৌথবাহিনী প্রত্যাহার তো দূরে থাক, নতুন করে 'শান্তির' নামে অভিযান শুরু হল। কলকাতার প্রতিটি কাফেতে, কেবিনে, কিংবা প্রেসিডেন্সি যাদবপুরে মাওবাদী জুজু দেখানো শুরু হল। মানে জনগণের হাতে রইল পেনসিল।

শিব ঠাকুরের আপন দেশে আইন কানুন সর্বনেশে

আর শিক্ষা! গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাটাকেই যেন গিনিপিগ পেয়েছেন নতুন সরকার। একটা একটা করে আসা যাক। প্রথমেই ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ভর্তি নিয়ে টালবাহানা। তারপর একবার বলা হলো শিক্ষক হতে গেলে স্কুল সার্ভিস-এর মূল পরীক্ষার আগে 'TET' দাও, আবার বলা হলো, থাক্ এ বছরটা, দুদিন পরই শুনলাম আবার নাকি 'TET' হবে! স্কুল ছাত্রছাত্রীদের মিটিং মিছিল সহ যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো, অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী শহিদ ক্ষুদিরামের ছবিতে মালা দিয়ে অশ্রুবিসর্জন করলেন। মারাত্মকভাবে, ক্লাস এইট পর্যন্ত পাশ ফেল তুলে দেওয়া হলো, যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাষ্ট্রের ঘাড় থেকে দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলা যায়। এল অর্ডিন্যান্স। বলা হলো, ছাত্র ও অশিক্ষক কর্মচারীদের নাকি বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের কোনো প্রয়োজনই নেই। এই সব করেই নাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দলতন্ত্রের আখড়া হয়েছে, অতএব এগুলিকে ছেঁটে ফেলা দরকার। আরো বেশি বেশি করে ক্ষমতা দেওয়া হলো আচার্যকে (পড়ুন সরকারকে)।

কেন বিরোধিতা অর্ডিন্যান্স-এর?

অর্ডিন্যান্স-এর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এক বার আউড়ে নেওয়া যাক।

১) উপাচার্য কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবেন না, তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় থাকা চলবে না এমনকি অতীতেও। যদি সেরকম ঘটে তবে আচার্য (রাজ্যপাল) তাঁকে বরখাস্ত করতে পারেন।

২) কোর্ট কাউন্সিলে সদস্য হবেন U G Dean-রা।

৩) বিভাগীয় প্রধানরা কোর্ট, কাউন্সিলের সদস্য হবেন alphabetic order-এ, বর্ণানুক্রমে।

৪) বিভাগীয় প্রধান ছাড়া অন্য কোনো শিক্ষক কোর্ট কাউন্সিলের সদস্য হতে পারবেন না।

৫) ছাত্র-অশিক্ষক কর্মচারীদের কোনো প্রতিনিধিত্ব থাকবে না।

এক। প্রথমে বলা হলো, উপাচার্য-র রাজনৈতিক পরিচয় থাকা চলবে না। এটা কেমন কথা? প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক ভারতীয়র অধিকার আছে রাজনৈতিক মতামত ধারণ করার। একজন উপাচার্য-র থাকবে না? নাকি একজন উপাচার্য হবার সাথে সাথে অরাজনৈতিক হয়ে যাবেন? তার মানে, উদ্দেশ্যটা অন্য। আসলে মান্যবর সরকার বলতে চেয়েছেন, উপাচার্য সরকার-বিরোধী রাজনীতি ধারণ করতে পারবেন না। আচার্যের হাতে খাঁড়া ঝুলিয়ে সব উপাচার্যকে সাবধান করে দেওয়া হলো, সরকারের ইয়েস-ম্যান না হলেই তোমায় বরখাস্ত করা হবে।

দুই। যারা অর্ডিন্যান্স তৈরি করেছেন তারা কি পশ্চিমবঙ্গের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিন যাননি? গেলে জানতে পারতেন যে ইউজি-ডিন বলে কোনো পদাধিকারী কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। নাকি অর্ডিন্যান্স জারির জন্য নতুন পদ তৈরি করবেন সরকার?

তিন। বিভাগীয় প্রধানরা কোর্ট কাউন্সিলের সদস্য হবেন। সাধু প্রস্তাব। কিন্তু বর্ণানুক্রমে? মানে A দিয়ে অ্যারবিক, B দিয়ে বেঙ্গলী, C দিয়ে কেমিস্ট্রি চলে গেল। কিন্তু S দিয়ে সংস্কৃত-এর সময় কবে হবে? অর্ডিন্যান্সে স্পষ্ট নয়। সাধে কি West Bengal-কে Paschimbanga করা হল! সংস্কৃতের বিভাগীয় প্রধানরা নতুন নাম ভাবুন!

চার-পাঁচ। বিভাগীর প্রধান ছাড়া বাকি শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারীদের কোর্ট কাউন্সিলে কোনো প্রতিনিধিত্ব রইবে না। অথচ এরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৯ শতাংশ। সরকার মনোনীত একগুচ্ছ সদস্য এদের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে নেবে। মানে, সমস্ত স্টেকহোল্ডাররা বাদ সিদ্ধান্তগ্রহণ থেকে। এও সম্ভব?

যুক্তি-কুযুক্তি-পাল্টা যুক্তি

বলা হলো, ছাত্রদের নাকি প্রয়োজন নেই কোর্ট কাউন্সিলে। কী অদ্ভুত! একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রাপ্তবয়স্ক, ভোটাধিকার-প্রাপ্ত। তার মতামত রাষ্ট্রও নিয়ে থাকে। আর ব্রাত্য-মমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় তাদের মতামতকে অগ্রাহ্য করছেন? বলা হচ্ছে, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ। ব্রাত্যবাবু কি জানেন

না, মুনিষ রাজা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, তিনি সিপিআই(এম) পার্টির সদস্য। ছাত্র প্রতিনিধিত্ব বাতিল করার বিষয়ে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ টানবেন, অথচ উপাচার্যের রাজনৈতিক অধিকার-অনধিকারের বিষয়টি চেপে যাবেন, তা তো হয়না! বলা হচ্ছে, ছাত্র-অশিক্ষক কর্মচারীরা খুব রাজনীতি করে, তাই ওদের কোর্ট কাউন্সিলে না থাকাই ভালো। বাহ্! আমি যদি বলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি বড্ড রাজনীতি করেন, আমাদের পোষাচ্ছে না, আপনার জায়গায় মমতাশঙ্কর মুখ্যমন্ত্রী হোন, ভালো লাগবে যুক্তিটা?

বলা হচ্ছে, ছাত্র প্রতিনিধি নাকি কাউন্সিলে গিয়ে কোনো কথাই বলতে পারে না, একা হয়ে কাঁচুমাঁচু মুখে থাকে, তাই বাদ। বেশ তো, তাহলে ছাত্র প্রতিনিধির সংখ্যা ২ থেকে ৫ বা ৭ করে দিন, তাহলেই কথা বলতে পারবেন তাঁরা।

বলা হচ্ছে দলতন্ত্র, অনিলায়ন সাফ করার কথা। আচ্ছা ব্রাত্যবাবু, আপনার নাকের ঠিক ওপরে একটা ফোঁড়া হলে আপনি নাকটা কেটে ফেলবেন নাকি? তাই তো করলেন। দলতন্ত্র নিকেশ করতে গিয়ে গণতন্ত্রটাই মুছে ফেললেন।

সরকারের প্রতি: কুযুক্তি দেবেন না, কারণ পাল্টা যুক্তি অসীম।

কুমীরের কান্না

অর্ডিন্যান্স জারির পর এসএফআই যা করলো তা দেখে এই দুটি শব্দের চেয়ে অন্য কিছু মাথায় আসতে পারে না। এমন একটা ভাব এসএফআই-সিপিএম-এর যেন গণতন্ত্র ছিল, তাকে সদ্য গলা টিপে মেরে ফেলা হলো।

আসলে কিন্তু গল্পটা অন্যরকম। বামফ্রন্ট জমানায় একটি কাউন্সিল বা কোর্টকে নমুনা হিসেবে বাছুন, এবার তাতে মনোনীত (সরকার দ্বারা) আর নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা গুনুন। দেখবেন মনোনীত সদস্যের সংখ্যা অন্ততপক্ষে এক বেশি নির্বাচিতর থেকে। মানে সরকার যা সিদ্ধান্ত নিতে চাইত তা সবসময়ই পাস হত। ছাত্র-শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের প্রতিনিধিরা ছিলেন যাকে বলে aaaaaaaa-দ্যাখো গণতন্ত্র আছে। এছাড়া সিপিএম-এর একটা সুবিধা ছিল। ছাত্র-শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের প্রতিনিধিরা প্রায় সবসময়েই তাদের লোকই হবেন। ফলে সরকারের পক্ষে কাজটা আরও সহজ হয়ে যেত। তার মানে, গণতন্ত্র আগেও ছিল না, এখনও নেই।

যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই

অর্ডিন্যান্স কেন? এতক্ষণের আলোচনা থেকে এটুকু পরিষ্কার যে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা সম্পূর্ণ নিজের হাতে রাখতে চাইছে। এর উদ্দেশ্য কি তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা? এটা কিন্তু অর্ধসত্য বা সিকি-সত্য। আসলে এর পেছনে রয়েছে একটা মস্ত বড়ো গল্প। বেচা- কেনার গল্প। ২০০৪ সাল থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কীভাবে উচ্চশিক্ষাকে বেচে দেওয়া চলছে। হাজার হাজার প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (এখন তো মেডিক্যাল কলেজও) খোলা হয়েছে, ব্যবসা শুরু করেছে বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও। আগামী দিনে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও তুলে দেওয়া হবে বেসরকারি হাতে। মানে, ধরা যাক 'অমুক' স্পনসর্ড ফিজিক্স ডিপার্টমেন্ট অব প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি। এরকমটা আশঙ্কা করা অমূলক নয়। প্রেসিডেন্সির মেন্টরদেরও সুপারিশ সেরকমই। এই শীতকালীন অধিবেশনেই আসছে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় আইন। এর ফলে উন্মুক্ত হচ্ছে শিক্ষার বাজার, শিক্ষা হয়ে উঠছে পুরোপুরি পণ্য। অর্ডিন্যান্স সেই উদ্দেশ্যেই। যাতে আরো মসৃণভাবে, বাধাহীন উপায়ে সরকারি দখলদারিতে রাখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে, সুযোগ পেলেই যাতে এগুলিকে তুলে দেওয়া যায় বেনিয়াদের হাতে, আরও ছোট করে আনা যায় উচ্চশিক্ষার পরিসর।

ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা যে ঐক্যবদ্ধভাবে এই ধরনের প্রজেক্টের বিরোধিতা করবে তা জানে কেন্দ্র-রাজ্য সরকার। তাই তাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে পরিচালন সমিতি থেকে। কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে উপাচার্যের। যদি না সরকার ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের অনুপাতে তাদের পরিচালন সমিতিতে জায়গা দেন, তবে অদূর ভবিষ্যতে বিরাট আন্দোলন গড়ে উঠবে শিক্ষার পরিসর জুড়ে।

অর্ডিন্যান্স হলে ছাত্রস্বার্থে কোথায় কোথায় আঘাত লাগবে তা একবার দেখে নেওয়া যাক। বলা হচ্ছে মডেল ইউনিভার্সিটির কথা যেখানে সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত অনবরত চলবে ক্লাস। যে ছেলেটি বা যে মেয়েটি চন্দননগর থেকে প্রেসি-ডেন্সিতে পড়তে আসে তার পক্ষে কোন্ যাদুমন্ত্রে এই রুটিন সামলানো সম্ভব? বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কীরকম যেন সেক্টর ফাইভ করে দেওয়ার পথে এগোচ্ছেন সরকার। উদ্দেশ্য যদি সেটাই হয় তবে তা রাজনীতি ভারি বিপজ্জনক। যেমনভাবে সেক্টর ফাইভ-এর কর্মীদের ইউনিয়ন করার অধিকার নেই তেমনি ছাত্র-শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের রাজনীতি করার অধিকার খর্ব করার খুব প্রয়োজন। একবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাইব লিংডো কমিশনের কথা। কী বলছে কমিশন? ছাত্রদের ইউনিভার্সিটিতে থাকবার কোনো প্রয়োজন নেই, ছাত্রদের ক্যাম্পাসে মিটিং-মিছিল করার অধিকার নেই, খবরদারির জন্য আনাচে-কানাচে বসবে সিসিটিভি। মনে হচ্ছে প্রেসিডেন্সি 'বিশ্ববিদ্যালয়' নয়, প্রেসিডেন্সি 'জেল'-এ পড়তে আসব। আসলে এই অর্ডিন্যান্স সিঁড়ির একটা ধাপমাত্র। এই অর্ডিন্যান্সের পিঠে চড়ে সত্যি হয়ে ওঠার চেষ্টা করবে ওপরের আশঙ্কাগুলো। অর্ডিন্যান্স- লিংডো- মডেল ইউনিভার্সিটি সবটাই আসলে একটা গল্প বলে। বেচাকেনার গল্প।

q লেখক বর্তমানে ছাত্র

প্রবন্ধ

দারিদ্রের রেখাচিত্র

প্রণব দে

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সমবায়' প্রবন্ধটা শুরু করেছিলেন একটা মস্ত ধাঁধাঁ দিয়ে— "*সকল দেশেই গরিব বেশি, ধনী কম। তাই যদি হয় তবে কোন্ দেশকে বিশেষ করিয়া গরিব বলিব। এ কথার জবাব এই, যে দেশে গরিবের পক্ষে রোজগার করিবার উপায় অল্প, রাস্তা বন্ধ।*" কবি যে উত্তরটা দিয়েছিলেন, পারিপার্শ্বিকতার বিচারে সেটা ছিল তাঁর অভিজ্ঞতা। কবি যদি আরও ষাট/সত্তর বছর বাঁচতেন, কোন দেশকেই তিনি 'গরিব' বলার জো পেতেন না। কারণ ধরাধামের সব দেশেই গরিবের পক্ষে "রোজগার করিবার উপায় অল্প, রাস্তা বন্ধ"। তাহলে কী সব দেশই ধনী হয়ে গেছে? গরিব দেশ কি পৃথিবীর মানচিত্র থেকে উধাও হয়ে গেছে? অসম্ভবের দেশেও যেটা অসম্ভব, সেটা যে হয় নি, সেটা আমরা জানি। আসলে যা তিনি কল্পনাতেও আনতে পারেন নি, সেটাই যে বাস্তব হয়ে দেখা দেবে, এটা বিশ্বকবি জানবেন কী ভাবে? বিশ্ব জুড়ে প্রতিযোগিতা চলছে ধনী থেকে ধনাঢ্য হওয়ার। এখানে গরিবের ভাবনা ভাবলে উন্নয়নের রথ থমকে যাবে। তার থেকে ভালো গরিবকেই অস্বীকার করা। ভাববার কোন দায় থাকে না।

উতোরচাপান

সম্প্রতি, সেপ্টেম্বর (২০১১) মাসে, একটি জনস্বার্থের মামলায় (পিইউসিএল বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া) ভারতের যোজনা পর্যদের তরফে দারিদ্রসীমাকে কেন্দ্র করে সুপ্রিম কোর্টে যে এফিডেবিট দাখিল করা হয়েছে, তা নিয়ে মিডিয়াতে ব্যাপক শোরগোল সৃষ্টি হয়েছে। মামলার বিষয়বস্তু হল 'খাদ্যের অধিকার'। যোজনা পর্যদ হলফনামা দিয়ে বলেছে, ভারতের গ্রামাঞ্চলে ২৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ৩২ টাকা যাদের রোজগার, তাদের কোনরকম কল্যাণমূলক প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে না। মোদ্দা কথাটা হলো কাগজে-কলমে খাদ্য সুরক্ষা আইন চালু হবে কিন্তু সরকার গরিবদের কোন দায় নেবে না। গণতন্ত্রের পীঠস্থান ভারতবর্ষে পেশাদারি রাজনীতিতে সোজা কথা সোজাসুজি বলার রেওয়াজ নেই। তাতে রাজনীতির অঙ্ক মেলে না। পরিকল্পনাবিদরা পরিসংখ্যান তত্ত্বের যে জটিল অঙ্ক দেয়, মানুষের বাস্তব জীবন-প্রবাহ তাতে চাপা পড়ে যায়। সাধারণ মানুষ বোঝে, কম করেও মাথার উপর ছাদ, ভদ্র গোছের পরিধান এবং দুবেলা পেটভরে খাবার যার না জোটে, সেই গরিব মানুষ। কিন্তু আমাদের দেশের পরিকল্পনাবিদরা অনেক অঙ্ক কষে বার করেছেন কোন মতে ২১০০ (শহরে) বা ২৪০০ (গ্রামে) ক্যালোরির খাবার জোগান দিতে পারলেই আর গরিব বলা চলবে না। এই তত্ত্ব নিয়ে তত সমালোচনা হচ্ছে না, যতটা হচ্ছে হলফনামায় উল্লিখিত টাকার অঙ্ক নিয়ে।

যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান মন্টেক সিং আলুওয়ালিয়া উদ্ভূত সমালোচনার প্রত্যুত্তরে বলেছেন— "গ্রামাঞ্চলে ৩৯০৫ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ৪৮২৪ টাকা (পাঁচজনের পরিবারে)— দারিদ্ররেখার সর্বশেষ হিসাবকে দৈনিক মাথাপিছু সংখ্যায় পরিবর্তিত করে সমাজকর্মীরা উচ্চকণ্ঠে যে সমালোচনা করছেন, তা এক নিষ্ঠুর ঠাট্টা। বহু মানুষকে এ সব বলে ভুল বোঝানো সম্ভব হচ্ছে, কারণ কখনো কখনো তাদের মনে হয়, দৈনিক প্রাপ্তিটাই বুঝি পারিবারিক বাজেট। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, দারিদ্ররেখা আমআদমীর উপযুক্ত স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপনের সীমারেখা নয়। *এটা এক দারিদ্র রেখা যার সংজ্ঞাই যথেষ্ট ক্লেশ সূচিত করে* (*দি হিন্দু*, ১২-১০-১১)।"

ঠাট্টাটা কে করছে, তা নিয়ে একটু ধন্দ জাগছে। জাতীয় শ্রম সংস্থার হিসাব অনুযায়ী, ২০০৯-১০ সালে গ্রামাঞ্চলে কৃষি-ভিত্তিক বৃত্তিতে পুরুষদের সর্বনিম্ন মজুরি ছিল ৬২.২৩ টাকা, সর্বাধিক ১৪০.৮১। একই ধরনের বৃত্তিতে মহিলাদের মজুরি ছিল ৪৬.৬৬/৮৬.৭১ টাকা। একই পরিবারে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাষের কাজে নিযুক্ত হলে পর সম্মিলিত দৈনিক মজুরি দাঁড়াত ১৮২.৪৫/১৯১.২৮ টাকা। মন্টেক সিং-এর হিসাবে গ্রামাঞ্চলে পাঁচ জনের পরিবারে দৈনিক ২৬ টাকা (একজন) থেকে ১৩০ টাকা (সম্মিলিত) রোজগার করতে পারলে, তাকে আর গরিব বলা যাবে না এবং তাদের আর খাদ্য সুরক্ষার প্রয়োজন নেই। বিষয়টা তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? ভারতের কৃষকদের আর গরিব বলা যাবে না। ঋণের দায়ে গত দশ বছরে প্রায় দু' লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলে কী হবে, অঙ্কের হিসাবে তাদের গরিবি ঘুচে গেছে।

দরিদ্রদের হিসেবনিকেশ

দরিদ্রের সংজ্ঞা এবং দারিদ্রের মাপকাঠি নির্ণয়কে কেন্দ্র করে এদেশে বিস্তর কমিটি ও গবেষণা হয়েছে। এক কমিটির হিসাবের সঙ্গে আর কমিটির হিসাব মেলে না। সরকারি হিসাবে ২০০৪-০৫ সালে ভারতে ২৭.৫ শতাংশ মানুষ ছিল দরিদ্র। সরকার নিযুক্ত সুরেশ তেণ্ডুলকার কমিটির মতে সেটা দশ শতাংশ বেড়ে হয়েছিল ৩৭.২ শতাংশ (যোজনা পর্যদের প্রেস নোট, ২৭ জানুয়ারি ২০১১)। এন সি সাক্সেনা কমিটি (২০০৯) এ দেশের ৫০ শতাংশ মানুষকে দরিদ্র তালিকাভুক্ত করেছিল। আবার অপর এক সরকারি কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, "২০০৪-০৫ সালের শেষে ৮৩.৬ কোটি অর্থাৎ জনসংখ্যার ৭৭ শতাংশ দৈনিক ২০ টাকার কম আয়ে জীবনযাপন করতেন এবং এরাই ভারতের প্রথাবহির্ভূত অর্থনীতির বৃহত্তম অংশ গঠন করেছে (অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটি, NCEUS, ২০০৭)।"

২০১১ সালের বিশ্বব্যাঙ্কের মানব উন্নয়ন রিপোর্টে, বহুমাত্রিক

দারিদ্র সূচকে (Multidimensional Poverty Index) পানীয় জল, শৌচাগার এবং আধুনিক জ্বালানি থেকে বঞ্চিত মানুষের প্রশ্নটিও আলোচিত হয়েছে। উন্নয়নের তালিকায় ১৭৪টি দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ১৩৪ নম্বরে। ভারতের ১২ শতাংশ মানুষের কপালে বিশুদ্ধ পানীয় জল জোটে না বা কষ্টসাধ্য ভাবে তা আহরণ করতে হয়। ৪৮ শতাংশ মানুষ উন্নত শৌচাগারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ৫১ শতাংশ কাঠ, ঘুঁটে ইত্যাদি চিরাচরিত জ্বালানি ব্যবহার করে। ৫২.৭ শতাংশ বহুমাত্রিক ভাবে বঞ্চিত। ৪১.৬ শতাংশের দিনে উপার্জন ১.২৫ ডলারের নীচে, ২৮.৬ শতাংশ অতি-দরিদ্র, ১৬.৪ শতাংশ দারিদ্র প্রবণ।

তথ্যের এ এক গোলকধাঁধা। বিভিন্ন কমিটি বা সংস্থা বিভিন্ন কোণ থেকে দারিদ্রের প্রশ্নটি বিচার করেছে। কমিটিগুলির বিচার্য বিষয় এবং দৃষ্টিভঙ্গিও একপ্রকার ছিল না। দারিদ্র নির্ধারণের প্রশ্নে বিতর্কটা আসলে সরকারের সুবিধাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। যতটা সম্ভব কম মানুষকে যতটা সম্ভব কম সুবিধা দেওয়ার মানসিকতা যদি সরকারের প্রবণতা হয় এবং যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা তথা সরকারি কোষাগার যদি কেবল অতিউচ্চ বিত্তশালীদের সেবায় নিযুক্ত থাকে, তাহলে তথ্যের কেবল ভারই মানুষকে বইতে হয়, তার ধার অনুভব করতে মানুষ ব্যর্থ হয়।

প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি

১৯৫৭ সালে পঞ্চদশ ভারতীয় শ্রম সম্মেলন ভারতের শ্রমজীবীদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি দিশা দিয়েছিল। শ্রম সম্মেলন প্রস্তাব নিয়েছিল:

১) ন্যূনতম মজুরি 'প্রয়োজন ভিত্তিক' হবে এবং সকল শিল্প শ্রমিকের জন্য ন্যূনতম মানবিক প্রয়োজন (minimum human need) নিশ্চিত করতে হবে— এটা স্বীকার করে নিয়ে, নিম্নবর্ণিত আদর্শমান, ন্যূনতম মজুরি কমিটি, ওয়েজ বোর্ড, সালিশীকার সহ মজুরি নির্ধারক সংক্রান্ত সকল কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা হিসাবে গৃহীত হলো:

ক) ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে, তিনটি উপভোক্তা এককের সমন্বয়ে, একজন উপার্জনকারীর আদর্শ শ্রমজীবী পরিবার গঠিত বলে বিবেচিত হবে। পরিবারের মহিলা, শিশু এবং কিশোরদের আয় গণ্য করা হবে না।

খ) ডাঃ অ্যাকরয়েডের সুপারিশ মেনে, মাঝারি ধরনের কাজকর্মে যুক্ত একজন প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয়ের পক্ষে উপযুক্ত নীট ক্যালরি প্রয়োজনের ভিত্তিতে ন্যূনতম খাদ্য প্রয়োজনীয়তা নির্ণীত হবে।

গ) মাথাপিছু বছরে ১৮ গজ বস্ত্র পরিধানের হিসাবে চার সদস্যের এক শ্রমিক পরিবারের মোট ৭২ গজ কাপড় ব্যবহার হয়— এই ভিত্তিতে বস্ত্র-প্রয়োজনীয়তা নির্ণীত হবে।

ঘ) আবাসনের ক্ষেত্রে, সরকারের শিল্প শ্রমিকদের জন্য আবাসন প্রকল্পে প্রদত্ত সবথেকে ছোট আয়তনের বাসস্থানের জন্য প্রদেয় বাড়িভাড়া, ন্যূনতম মজুরি নির্ণয়ে বিবেচিত হবে।

ঙ) মোট ন্যূনতম মজুরির ২০ শতাংশ, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও বিবিধ খরচ বাবদ ধরা হবে।

২) ন্যূনতম বেতন উপরোক্ত আদর্শমানের নীচে যদি স্থির করা হয়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করতে হবে, কোন্ পরিস্থিতিতে উক্ত মানে স্থির থাকতে তারা বাধাপ্রাপ্ত হলো।

৩) ন্যায্য মজুরি বা ফেয়ার ওয়েজ নির্ধারণ প্রসঙ্গে, ফেয়ার ওয়েজ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ওয়েজ বোর্ডগুলির প্রতিটি শিল্প সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবেচনা বিচার করা উচিত।
(Wage Determination- P R Sinha)।

ন্যূনতম মানবিক প্রয়োজন বলতে শুধুমাত্র খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের কথাই ভাবা হয়েছে। এটাকে 'মানবিক প্রয়োজন' না বলে 'জৈবিক প্রয়োজন' বলাই উচিত। জঙ্গলে থাকলেও মানুষের এই কয়েকটি বস্তুর প্রয়োজন হয়। কিন্তু সভ্য জগতে মনুষ্য পরিচয়ে বাঁচার জন্য আরও কিছু ন্যূনতম প্রয়োজন যে আছে, এ কথা এদেশের সর্বোচ্চ আদালতে স্বীকৃত হলেও, শাসক সম্প্রদায় এবং পরিকল্পনাবিদদের বিবেচনায় সেগুলো গরিব মানুষের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। ১৯৯১ সালে '*শ্রমিক ইউনিয়ন বনাম র‍্যাপটাকোস ব্রেট কোম্পানি*' মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সুপারিশ করেছিল— "*শিশু শিক্ষা, চিকিৎসা, উৎসব-বিনোদন অনুষ্ঠান, বার্ধক্য জীবনের জন্য সঞ্চয়, বিবাহ ইত্যাদি বাবদ মোট ন্যূনতম বেতনে আরও ২৫ শতাংশ যোগ করা উচিত।*"

খাদ্যশক্তির ক্ষেত্রে ডঃ অ্যাকরয়েডের অভিমত ছিল— মাঝারি ধরনের কাজকর্মে রত একজন পুরুষের ন্যূনতম প্রয়োজন ৩০০০ ক্যালরি, ভারি কাজের ক্ষেত্রে ৩৬০০ ক্যালরি। অনুরূপ ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রয়োজন ২৫০০ এবং ৩০০০ ক্যালরি। সরকার শেষ পর্যন্ত ২৭০০ ক্যালরি নীট খাদ্যশক্তি উপভোগের বিচারে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের প্রস্তাব করে। শিল্প শ্রমিকদের জন্য সরকারি আবাসন প্রকল্পে নির্দিষ্ট মান ছিল— এক কক্ষ বিশিষ্ট গৃহের ক্ষেত্রে ২৩২ বর্গফুট, দুই কক্ষ বিশিষ্ট গৃহের ক্ষেত্রে ৩৫৬-৪৫২ বর্গফুট। শ্রম সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তে বাড়িভাড়া উপাদানের ক্ষেত্রে এটাই ছিল নির্দিষ্ট মান।

যত মত, তত পথ

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সংস্থান যার না থাকে, সাধারণ মানুষ তাকেই হতদরিদ্র বলে। সরকারি অধিবেশনে তার একটা মাপকাঠি নির্ধারিত হলো। সরকার কিন্তু সেটা দারিদ্রসীমা হিসাবে মানল না। (ন্যূনতম মজুরি, যেটা কয়েক বছর অন্তর ঘোষিত হয়, তাতে ন্যূনতম প্রয়োজন মেটে কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু বিষয়টা আমাদের আলোচনার পরিধির বাইরে)। দারিদ্রসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান উপাদান হলো খাদ্যশক্তি উপভোগের মাত্রা বা পৌষ্টিক মান। শ্রম সম্মেলন যে মাত্রা ধার্য করেছিল, তা আদর্শ পৌষ্টিক মানের থেকে সামান্য কম। দারিদ্রসীমা নির্ধারণের জন্য যে কমিটিগুলি নিযুক্ত হয়েছিল, তাদের সুপারিশ করা পৌষ্টিক মান, শ্রম

সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তের থেকেও কম। ১৯৬২ সালে যোজনা পর্যদ নিযুক্ত কমিটির হিসাবে দারিদ্ররেখা ছিল মাসে মাথাপিছু ২০ টাকা বা পাঁচজনের পরিবারের ক্ষেত্রে মাসে ১০০ টাকা (১৯৬০-৬১ সালে)। স্বাস্থ্য, শিক্ষাব্যয় উক্ত কমিটি গণনা করে নি। ১৯৭১ সালে এক বিশেষজ্ঞ কমিটি (Expert Body) নিয়োগ করা হলো। বিশেষজ্ঞ কমিটি অভিমত প্রকাশ করল, ২২৫০ ক্যালরির শক্তি ভারতীয়দের পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং তাদের হিসাবে ১৯৬০-৬১ সালে দারিদ্রসীমার মান নেমে দাঁড়াল গড়ে ১৮.৭৫ টাকা— শহরে ২২.৫০ টাকা, গ্রামাঞ্চলে ১৫ টাকা। ১৯৭৯ সালে যোজনা পর্যদ আবার এক টাস্ক ফোর্স নিয়োগ করে। টাস্ক ফোর্স পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনের সিদ্ধান্ত আলোচনা করলেও, কোন আদর্শ পৌষ্টিক মান তারা মানতে রাজি হয় নি। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (এনএসএস) প্রদত্ত তথ্য বিচারে (১৯৭৩-৭৪ সালকে ভিত্তি করে) মানুষ যতটা খাদ্যশক্তি ক্রয়ের ক্ষমতা রাখে, সেটাই তাদের মতে পৌষ্টিক মানের সীমারেখা। তাদের হিসাবে গ্রামাঞ্চলের মানুষ ২৪৩৫ ক্যালরি এবং শহরাঞ্চলে ২০৯৫ ক্যালরি, পূর্ণ সংখ্যায় যথাক্রমে ২৪০০ এবং ২১০০ ক্যালরি মাত্রার পুষ্টি ক্রয়ের ক্ষমতা রাখে। তার জন্য প্রতি মাসে মাথাপিছু প্রয়োজন যথাক্রমে ৪৯.০৯ টাকা এবং ৫৬.৬৪ টাকা। এটাই টাস্ক ফোর্সের অভিমতে দারিদ্রমাত্রা। এই আর্থিক মানকে মূল্যসূচক অনুযায়ী পরিবর্তিত করে দারিদ্রসীমা নির্ধারিত হত। অবশ্য দারিদ্রসীমার আর্থিক মান নির্ধারণও বিতর্কের উর্ধ্বে ছিল না। এরপর আরও দুটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়েছিল। একটি ১৯৯৩-৯৪ সালে এবং সর্বশেষ ২০০৫ সালে সুরেশ তেণ্ডুলকর কমিটি। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে রাজ্যভেদে দারিদ্রসীমার মানও পৃথক হয়ে গেল।

তেণ্ডুলকর বিতর্ক

তেণ্ডুলকর কমিটির সুপারিশে বলা হলো— "It may be noted that although those near the poverty line in urban areas continue to afford the original calorie norm of 2100 per capita per day, their actual observed calorie intake from 61st Round of NSS of is 1776 calories per capita. This actual intake is very close to the revised calorie intake norm of 1770 per capita per day currently recommended for India by the Food and Agriculture Organization (FAO). Actual observed calorie intake of those near the new poverty line in rural areas (1999 calories per capita) is higher than the FAO norm."। অর্থাৎ তেণ্ডুলকর কমিটি দীর্ঘকাল অনুসৃত ২৪০০/২১০০ ক্যালরি মাত্রা থেকেও সরে এল। ১৭৭০ ক্যালরি খাদ্যশক্তি গ্রহণের ভিত্তিতে এই কমিটি দারিদ্র সীমারেখা ধার্য করে। ফাও নির্দেশিত মানের সঙ্গে সাযুজ্য রাখতে এনএসএস-এর ৬১-তম রাউণ্ডের তথ্য অনুযায়ী অধিকাংশ মানুষের বাস্তবিক প্রাপ্তি বা ব্যয় ক্ষমতাকে এই কমিটি দারিদ্রসীমা হিসাবে চিহ্নিত করল। তেণ্ডুলকর কমিটির হিসাবে, ২০০৪-০৫ সালে প্রতিমাসে মাথাপিছু দারিদ্ররেখার মাত্রা ছিল গ্রামে ৪৪৬.৬৮ টাকা (দৈনিক ১৪.৮৯ টাকা) এবং শহরে ৫৭৮.৮০ টাকা (দৈনিক ১৯.৩০ টাকা)।

সমীক্ষা বছর	*জনসংখ্যা* (কোটি)*	*খাদ্যশস্য উৎপাদন (মিঃ টন)*	*মাথাপিছু দৈনিক খাদশস্য প্রাপ্তি (গ্রাম)*	*মাথাপিছু পুষ্টি (ক্যালরি)*	
				গ্রামে	*শহরে*
১৯৭২-৭৩	৫৪.৮২	৯৭.০৩	৪৬৬.১	২২৬৬	২১০৭
১৯৮৩	৬৮.৩৩	১৫২.৩৭	৪৩৭.০	২২২১	২০৮৯
১৯৯৩-৯৪	৮৪.৬৪	১৮৪.২৬	৪৬৪.১	২১৫৩	২০৭১
১৯৯৯-০০	১০২.৮৭	২০৯.৮	৪৬৫.৭	২১৪৯	২১৫৬
২০০৪-০৫		১৯৮.৩৬	৪১৬.২	২০৪৭	২০২০

* সেন্সাস রিপোর্ট— ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১, ২০০১

এনএসএস খাদ্য উপাদানের ক্ষেত্রে শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ অনুসরণ করে অর্থাৎ তাদের সমীক্ষায় পূর্ণ পৌষ্টিক মান ২৭০০ ক্যালরি। এনএসএস-এর সমীক্ষা এবং সরকারি তথ্য (indiastat.com) থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার, পূর্ণমানের পুষ্টি আজ পর্যন্ত ভারতের অধিকাংশ মানুষের কাছে অধরা। বরং স্বাধীনতার বয়স যত বেড়েছে, ভারতের মানুষ তত বেশি অপুষ্টির শিকার হয়েছে। তিন দশক আগে, সাধারণ মানুষের ভাগে যত খাদ্যশস্য জুটত, এখন মাথাপিছু প্রাপ্তির পরিমাণ তারও নীচে নেমে গেছে (সারণি দ্রষ্টব্য)। জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে খাদ্যাভাবের জন্য দায়ী যাবে না। ২০০০ সাল পর্যন্ত, বাৎসরিক জনবৃদ্ধির হার যেখানে ২.৩ শতাংশ, খাদ্য উৎপাদন সেক্ষেত্রে বেড়েছে বছরে ৩.২ শতাংশ হারে। ২০০০ সালের পরের পাঁচ বছরে খাদ্য উৎপাদন কমেছে ৫.৭৭ শতাংশ, কিন্তু মানুষের খাদ্যশক্তি প্রাপ্তি কমেছে তার দ্বিগুণ— ১১.৮৯ শতাংশ। এনএসএস সমীক্ষা অনুসারে ২০০৪-০৫ সালে গ্রামাঞ্চলে ৬৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৭০ শতাংশ মানুষের পূর্ণ মানের (২৭০০ ক্যালরি) শক্তি ক্রয়ের সামর্থ্য ছিল না। তাহলে এই বাড়তি খাদ্য যাচ্ছে কোথায়? বিশাল পরিমাণ খাদ্য অপচয়ে নষ্ট হয়, না হয় অত্যধিক দামের কারণে, খাদ্যশস্য গরিব মানুষের নাগালের বাইরে থেকে যায়। এ ছাড়া, এমন কিছু বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে, যাতে খাদ্য সমস্যার সুসার হয় না, কিন্তু মোটা অঙ্কের মুনাফা লোটা যায়। ২০১০ সালে মন্ত্রী শারদ পাওয়ার নিজেই স্বীকার করেছিলেন, শুধুমাত্র সংরক্ষণ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য ফি বছর প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয় (*তেহেলকা*, ০৭/০৮/১০)।

বিপিএল গণনা- ২০১১

২০১১ সালে বিপিএল গণনার ক্ষেত্রে, সরকার গ্রামীণ পরিবার-গুলিকে তিনটি বর্গে ভাগ করতে বলেছে— ক) কিছু পরিবারকে সরাসরি গণনা থেকে বাদ দেওয়া হবে; খ) কিছু পরিবারকে

সরাসরি বিপিএল অন্তর্ভূক্ত করা হবে এবং গ) কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে যাদের বিপিএল ভুক্ত করা হবে।

পরিবারের কোন সদস্যের যা যা সম্পত্তি থাকলে গণনা থেকে সরাসরি বাদ যাবে, সেগুলি হলো— মোটর চালিত ভ্যান বা রিক্সা, মাছ ধরার জন্য নিবন্ধীকৃত নৌকা, ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, হার্ভেস্টার, ৫০ হাজার টাকার কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, সরকারি চাকুরিজীবী, ব্যবসাদার, দশ হাজার টাকা বেতন, পাকা ছাদ ও দেওয়াল সমেত তিন কক্ষের বাড়ি, রেফ্রিজেটর, ল্যান্ডলাইন ফোন, ২.৫ একর বা তার বেশি সেচসেবিত জমি এবং একটি সেচযন্ত্র, ৫ একর বা তার বেশি সেচসেবিত দুফসলি জমি, ৭.৫ একর বা তার বেশি কৃষিজমি এবং একটি সেচযন্ত্র।

সরাসরি যারা বিপিএল অন্তর্ভূক্ত হবে, তারা হলো— গৃহহীন পরিবার, ভিক্ষাজীবী অথবা সহায়-সম্বলহীন পরিবার, সাফাইকারী, আদিম জনজাতি গোষ্ঠী, মুক্ত বন্ডেড লেবার।

এছাড়া যাদের এক ঘরের কাঁচা বাড়ি, যে পরিবারে ১৬ থেকে ৫৯ বছরের মধ্যে কোন পুরুষ নেই অথবা শুধু নাবালক আছে, অভিভাবকহীন প্রতিবন্ধী পরিবার, এসসি/এসটি পরিবার, যে পরিবারে ২৫ বছরের বেশি অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন সদস্য নেই, কায়িক শ্রমে জীবিকা নির্বাহ করে এমন ভূমিহীন পরিবার— এরা সংগৃহীত পয়েন্টের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে বিপিএল তালিকাভুক্ত হতে পারে। সাতটি বিষয়ে সর্বাধিক মান ৭। তবে গণনা-বহির্ভূত বর্গের এবং যোজনা পর্যদ নির্ধারিত দারিদ্র মানের উপরে অবস্থিত কোন পরিবারকে বিবেচনা করা হবে না।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলেই দেওয়া হয়েছে, কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিতে যেহেতু সবাইকে একসাথে নেওয়া যাবে না, সেইহেতু অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যোগ্যতামান স্থির হবে। এনএসএস সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, ২০০৪-০৫ সালে যে সব প্রান্তিক কৃষকের মাত্র ২.৫ শতক জমি আছে (১.৭ কাঠা), তাদেরও মাসিক ব্যয় ক্ষমতা ৫৭৪.২৮ টাঃ অর্থাৎ দৈনিক ১৯.১৪ টাকা। অর্থাৎ এরাও যোজনা পর্যদের লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করে গেছে। ভ্যান চালক, রিক্সা চালক, প্রান্তিক কৃষক— এদেরও যে এ দেশে খাদ্য সুরক্ষার প্রয়োজন হয় না, তা তো সত্যিই শ্লাঘার বিষয়।

দারিদ্রসীমার মাত্রা ক্রমাগত কমিয়ে ভারত সরকার এ দেশের প্রান্তিক ও গরিব মানুষের জীবনযাত্রার দুরবস্থা গোপন করার যে চেষ্টা চালাচ্ছে, তাতে চালু এক প্রবাদ মনে পড়ে— শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা। দারিদ্রসীমা একটা আধার। আধারটাকে চাপ দিয়ে যতই ছোট করা হবে, তত বেশি মানুষ আধারচ্যুত হবে। এইভাবে চাপ দিতে দিতে একটা সময়ে আধারটাই বিলীন হয়ে যাবে। দরিদ্র বলে এ দেশে কেউ আর থাকবে না। উন্নয়নের ষোলকলা পূর্ণ হবে।

যুদ্ধ

অশোক চট্টোপাধ্যায়

The problem is not falling a captive
It's how to avoid surrender — Nazim Hikmat

সমস্ত ঘরের মধ্যে
অসহায় হাত-পা ছুঁড়ছে
দমবন্ধ কান্না

তারপর দেওয়াল ভেঙে
ঘর আর বাহির
একাকার

সময়ের পিঠে কার যেন
রক্তের দাগ
লেপ্টে দিয়েছে

শায়িত আঙিনায়
স্পন্দনহীন
শহিদের লাশ

বুকের পাথর ভাঙতে ভাঙতে
মা এসে হাত রাখে
সন্তানের গায়

অশ্রু নয়
জ্বলে ওঠে চোখের আগুন:
ওঠ বাবা
যুদ্ধে যাবি না...

নভেম্বর ২৮, ২০১১

‘স্বপ্ন’

অর্জুন রায়

সবাই যখন সুখের খোঁজে
আপস করে খোপের মাঝে—
মুখ লুকিয়ে বালির ভিতর
সহ্য করে ঝড়—

তখনও কেউ সাহস করে
মানিয়ে নেওয়ার কায়দা ভুলে
আরেকটা দেশ গড়তে চেয়ে
ছাড়তে পারে ঘর।

জীবনটা যায় পথের ভুলে
শাল-মহুয়ার নির্জনেতে—
তবু তো কেউ ভাবতে পারে
অন্য স্বদেশ হয়—

দিন যাপনের যাঁতাকলে
আমরা সেসব গেছিই ভুলে—
নতুন একটা ভারতবর্ষ
সম্ভাবনাময়।

প্রবন্ধ

দুষ্টচক্রের পুঁজিবাদ

রাজনীতি তলিয়ে যায় অতল দুর্নীতিতে

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

মন্ত্রীর কষ্ট

১০ই অক্টোবর, ২০১১। ঝুলি থেকে বেড়াল অনেক আগেই বেরিয়ে পড়েছিল। এবার 'ম্যাও' করে উঠল।

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী সলমন খুরশিদ তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে প্রকাশ করে ফেললেন সরকারের মনোভাব : ''যেভাবে নামী দামী কর্পোরেট সংস্থার শীর্ষকর্তাদের সুপ্রিম কোর্ট জেলে পুরছেন, তাতে তো আর দেশে কোনও সংস্থা লগ্নিই করবে না।'' আইনমন্ত্রীর এ হেন মন্তব্যে বিস্মিত শীর্ষ আদালত বিস্ময়ে বলেই ফেললেন— ''তাহলে কি আমরা সময় নষ্ট করছি?'' মন্ত্রীর সাফাই—''কেউ অর্থনীতির বিষয়টা বুঝতে চাইছেন না। সরকার চালানো যে কী ভীষণ সমস্যা হয়ে গেছে প্রতিদিন তা বলবার নয়। এভাবে কি আর অর্থনীতির উন্নতি সম্ভব?'' (সূত্র : *একদিন*, ১১ অক্টোবর, ২০১১)

একের পর এক দেশ কাঁপানো দুর্নীতি আর আর্থিক কেলেঙ্কারিতে যখন ইউপিএ সরকার বেসামাল, তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই মন্তব্যই তুলে ধরে সরকার পরিচালনার সার সত্যটা। এদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নামে যেভাবে বেসরকারি লগ্নিপুঁজিকে আবাহন জানানো হচ্ছে, তাতে দুর্নীতি অবশ্যম্ভাবী। মন্ত্রীর বক্তব্য— দুর্নীতি দূর করতে গিয়ে কর্পোরেট কর্তাদের জেলে পুরলে কর্পোরেট স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, তার ফলেই তাঁরা লগ্নিবিমুখ হয়ে পড়ছেন। তাহলে কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে দুর্নীতির মধ্যে দিয়েই কর্পোরেট পুঁজি স্বার্থ চরিতার্থ করে চলেছে। আর তা সত্ত্বেও সরকার তাতে মদত জোগাচ্ছেন 'অর্থনীতির উন্নতি'র দোহাই দিয়ে। এটা কি হতে পারে উন্নয়নের যুক্তি? নাকি জলের দরে দেশের সম্পদ কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যে কর্পোরেট স্বার্থেই এবার সরাসরি ময়দানে নেমে পড়লেন তাদের বংশবদ মন্ত্রীরা!

''ঘৃণ্য চক্রান্ত''

শুধু আইনমন্ত্রীর বক্তব্যই নয়, গোটা ইউপিএ সরকারের সিদ্ধান্তই এখন বেসরকারি লগ্নিপুঁজির স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে। আগে বিজেপি প্রভৃতির আমলেও সেটা ঘটেছে। প্রতিটি প্রকাশিত কেলেঙ্কারিই কার্যত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে এদেশে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার একের পর এক দুর্নীতি ঘটে চলেছে। সুপ্রিমকোর্ট স্পষ্টই জানিয়েছেন, টু-জি স্পেকট্রাম বিক্রি যে জলের দরেই হচ্ছে এটা জানত দেশের অর্থমন্ত্রক এবং প্রধানমন্ত্রীর অফিস। তবু অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও 'উন্নয়ন'-এর স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী কোন ব্যবস্থাই নেন নি। অথচ এই অভিযোগে ধরা হলো কেবলমাত্র টেলিকম মন্ত্রী ডি রাজা, তাঁর সচিব, প্রাক্তন বস্ত্রমন্ত্রী দয়ানিধি মারান, টেলিকমের বিভিন্ন কর্পোরেট কর্তা সহ মোট ১৪জনকে। প্রধানমন্ত্রী চাইলে এই কেলেঙ্কারি বন্ধ করতে পারতেন, এই কেলেঙ্কারির মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন টেলিকম মন্ত্রী এ রাজা একথা সিবিআই-কে জানিয়েছেন। একইভাবে কমনওয়েলথ গেমসে যে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে বিনা টেন্ডারে কোটি কোটি টাকার বরাত দেওয়া হয়েছিল, সেখানেও দুর্নীতির প্রাথমিক প্রমাণ মিলেছে। এ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তৎকালীন দুই কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী। তবুও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের দরাজ অনুমোদনেই মূল অভিযুক্ত কালমাডি যথেচ্ছ স্বাধীনতা পেয়েছেন। সাংলু কমিটির পর এবার ক্যাগ (CAG)-এর রিপোর্টেও দেখা যাচ্ছে কমনওয়েলথ গেমসের দুর্নীতির ক্ষেত্রে সরাসরি অভিযুক্ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী শীলা দীক্ষিতও। এয়ার ইন্ডিয়া বা কে জি বেসিন চুক্তিতে সরকারের বিপুল ক্ষতির পিছনেও রয়েছে সরকারি প্রশ্রয়ে বেসরকারি কর্পোরেট পুঁজিকে মুনাফা পাইয়ে দেওয়ার প্রবণতা। কে জি বেসিনে উৎপাদনের খরচ বাড়িয়ে দেখিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার মুনাফা তুলে নেয় রিলায়েন্স। চোখ বুজে থাকে সরকার। ক্যাগ সম্প্রতি জানিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় কয়লা মন্ত্রকও কয়লা সরবরাহে রিলায়েন্স পাওয়ারকে ১ কোটি ২০ লাখ টাকার অন্যায্য সুবিধা দিয়েছে। ব্যক্তিগত লোভ আর লালসায় মহারাষ্ট্রে কার্গিলযুদ্ধের শহিদদের জন্যে তৈরি আদর্শ আবাসনে বঞ্চিত হয় মৃত সৈনিকের পরিবার। মন্ত্রী আমলা কর্পোরেটরা পান তার সুযোগ। ইস্তফা দিতে হয় মহারাষ্ট্রের কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী। একইভাবে জমি কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে ইস্তফা দিয়েছেন কর্নাটকে বিজেপির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগ উঠেছে উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা মুখ্যমন্ত্রীদের বিরুদ্ধেও। ওড়িশায় পস্কো এবং নিয়মগিরিতে কীভাবে কর্পোরেট স্বার্থে অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে তা সবাই জানে। বস্তুত উদার অর্থনীতি চালু হওয়ার পর জমি-জল-জঙ্গলে যে কর্পোরেট আগ্রাসন ঘটেছে তার পিছনে রয়েছে কেন্দ্র এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ মদত। একের পর এক ঘটনায় দুর্নীতি বা রাজকোষের অর্থনীতির দৃষ্টান্ত তুলে ধরে দেশের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (ক্যাগ) ও নানা মামলায় দেশের শীর্ষ আদালত সরকার আমলা রাজ-নীতিক-দল-মন্ত্রীদের সঙ্গে একশ্রেণীর কর্পোরেটের দুষ্ট আঁতাত প্রকাশ করে দিয়েছেন। নয়ডায় জনস্বার্থের নামে চাষীদের কাছ থেকে জোর করে জমি অধিগ্রহণের পর সেই জমি তুলে দেওয়া হয় রিয়াল এস্টেটের কারবারিদের হাতে। সেই মামলার রায় দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেন : ''এ এক ঘৃণ্য জঘন্য চক্রান্ত।''

প্রতারণার উৎস উদারনীতি

কর্পোরেট-রাজনৈতিক-সরকারের এই 'ঘৃণ্য' চক্রান্তেই লুঠ হচ্ছে দেশের সম্পদ। একের পর এক আর্থিক সংস্কারের নামে আইন পরিবর্তন করে জলের দরে লিজ দেওয়া হচ্ছে দেশের সম্পদ। দেশিবিদেশি পুঁজির কাছে নিঃস্ব হচ্ছে দেশের সাধারণ মানুষ। কেড়ে নেওয়া হচ্ছে তাদের জমিতে বসবাস ও চাষের অধিকার, কেড়ে নেওয়া হচ্ছে অরণ্যবাসীর কাছ থেকে অরণ্যের অধিকার। কেড়ে নেওয়া হচ্ছে 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবে'র নামে মার্কিন মদতপুষ্ট 'কৃষি জ্ঞান' কর্মসূচিতে চাষির কাছ থেকে বীজের অধিকার, কর্পোরেট স্বার্থে তৈরি হচ্ছে জাতীয় উৎপাদন অঞ্চল, ইতিপূর্বে তৈরি হয়েছে 'সেজ' বা 'বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল'), কেড়ে নেওয়া হচ্ছে সেখানে শ্রমিকের অধিকার, এমনকি কর্পোরেটের মুনাফার লালসা মেটাতে দেশের বিভিন্ন আইন পরিবর্তন করে এবং একচেটিয়া ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ আইন লঘু করে নানা পণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্যে, এমনকি দেশের স্বাস্থ্য-চিকিৎসা-ওষুধ উৎপাদনেও, সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে বিপুল খরচের বাধ্যবাধকতা। লাভজনক সরকারি সংস্থাগুলিকে ক্রমশ রুগ্ন বা দুর্বল করে সেই সব ক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজির রমরমা ঘটাতে কর্পোরেটদের দেওয়া হয়েছে বিপুল সুবিধা ও ছাড়। প্রতিবারই প্রতিক্ষেত্রে সরকারের তরফে এহেন উদ্যোগের একটি জনমনোরঞ্জনকারী মোড়ক দিয়ে বলা হয়— এভাবে উৎপাদনশীলতা বাড়বে। বেসরকারি লগ্নি যত বাড়বে ততই বাড়বে কর্মসংস্থান। মানুষের কাজের সুযোগ বাড়বে। বাড়বে আয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে। মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার দেখিয়ে বলা হচ্ছে ঃ দেশে দারিদ্র্য ও জিডিপি নিরুপণের পদ্ধতি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। এগিয়ে চলেছে। অথচ সবই ডাহা মিথ্যা। গত বিশ বছরে কর্পোরেট পুঁজি ক্রমশ বেড়ে চললেও, তার একটা বড়ো অংশই গেছে ফাটকা বাজারে, ফলে সরকার যত বিজ্ঞাপন দিক, কর্মসংস্থান সামান্যই বেড়েছে। বেকারি-র হারের সাম্প্রতিকতম (২০১০) হিসেব থেকে ধরা পড়েছে, সংগঠিত শিল্পে বেকারি গত বিশ বছরে কমেনি, বরং বেড়েছে। আর অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বেড়েছে মাত্র ১.৪ শতাংশ। সরকারি তথ্য থেকেই এসব পাওয়া যাচ্ছে।

সরকারি স্তরে এই প্রতারণার মূল উৎস হলো উদারনীতি এবং তার মূল প্রকরণ হলো রাজনীতিক আর কর্পোরেটের আন্তঃসম্পর্ক— দেওয়া-নেওয়ার সমীকরণ। বিশ্বপুঁজির কাছে আত্মসমর্পণ করে বিশ্ব বাণিজ্য চুক্তির হাত ধরে বিশ্বায়নের নামাবলী জড়িয়ে এদেশের রাজনীতিকুল ক্রমশ মার্কিন লবির অনুগামী এবং কর্পোরেট পুঁজির ধ্বজাধারী হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে কংগ্রেস, বিজেপি দুই প্রধান জাতীয় দলসহ সব আঞ্চলিক দল একই নীতি অনুসরণ করেছে। উদারনীতিকেন্দ্রিক এই রাজনীতিই দেশের সরকার পরিচালনায় পুঁজির এক দুষ্টচক্র গড়ে তুলছে। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের যৌথ অংশ-দারিতেই হোক আর অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজির সরাসরি আহ্বানেই হোক— সর্বক্ষেত্রেই নীতিহীন সরকারি সিদ্ধান্তে বিপন্ন হচ্ছে দেশের স্বার্থ, রাজনীতিকরা বাঁটোয়ারা করেছেন ক্ষমতা, কর্পোরেটরা তা কিনছে গোপন চুক্তিতে! তারই ফলে যেমন লাভবান হয়েছে কর্পোরেট জগত, তেমনই এই সময়ে অবিশ্বাস্যভাবেই ব্যক্তিগতভাবে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে এদেশের রাজনৈতিক কুল। নর্থ ব্লকে প্রলম্বিত হয়েছে কর্পোরেট-মন্ত্রী-আমলা-নেতার গোপন আঁতাত। অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে বলে 'ক্রোনি ক্যাপিটালিজম' বা দুষ্টচক্রের পুঁজিবাদ।

দুষ্টচক্রের পুঁজিবাদই বদলে দিয়েছে রাজনীতি আর দুর্নীতির রসায়ন। আগে দুর্নীতি করে মানুষ রক্ষা পেতে রাজনীতির আশ্রয় চাইত। এখন রাজনীতিই করা হচ্ছে দুর্নীতির উদ্দেশ্যে। উদারনীতিই এই দুয়ের আন্তঃসম্পর্কের অভিমুখে পরিবর্তন ঘটায়। এদেশে রাজনীতির এমন অবক্ষয় আগে কখনও দেখা যায় নি।

উদারনীতি প্রচলনের আগে ছিল প্রায় দুর্লঙঘ্য লাইসেন্স-রাজ। সরকারি নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ির অন্তরালে চলত ঘুষের বিনিময়ে সরকারি সুযোগ ও অনুদান বা অনুমোদন প্রাপ্তির কসরৎ। ফলে এদেশের রাজনীতির মূল উপজীব্য ছিল সরকারি ক্ষমতা— যা থেকে বেআইনি পথে উৎসাহিত হতো কালো টাকার স্রোত। উদার অর্থনীতি যেমন দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ এনেছিল, তেমনই সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দেশের সম্পদকে কুক্ষিগত করার চক্রান্তের পথও প্রশস্ত হলো। ঘুষ-দেওয়া-নেওয়া-কাটমানির রথে চড়ে কালোটাকার অর্থনীতিই সবল করে তুলল রাজনীতিক-কর্পোরেটের যৌথ বোঝাপড়ায় দুষ্টচক্রের পুঁজি নির্মাণ। নামমাত্র মূল্যে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে লিজের মাধ্যমে বা নানা চুক্তির আড়ালে দেশের জমি-খনি-সমুদ্র-আকাশের স্পেকট্রামে কায়েম হতে থাকল বেসরকারি অধিকার। লাইসেন্স রাজের বদলে শুরু হলো কর্পোরেটরাজ। অভিযোগ, এজন্যে গোপন লেনদেনে বিভিন্ন দল ও নেতারাই সরকার ও মন্ত্রীর সাহায্যে কর্পোরেট লুণ্ঠনে অগ্রণী সেনার ভূমিকা নিয়েছে। সরকারি আমলারা ওতঃপ্রোতভাবেই জড়িয়ে গেছেন। এটাও সত্যি যে, সরকারে থেকেও যাঁরা কর্পোরেট স্বার্থে কাজ করেছেন বলে অভিযুক্ত হয়েছেন, পরবর্তীকালে তাঁদের একাংশ সরকারি চাকরির মেয়াদ শেষে কিংবা চাকরি ছেড়ে অবসর নিয়ে বিভিন্ন কর্পোরেটের উচ্চপদে অভিষিক্ত হয়েছেন। ক'দিন আগেই দিল্লিতে জাতীয় সড়ক নির্মাণে সরকার-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ নিয়ে আলোচনাচক্রে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন— এ জাতীয় যৌথ উদ্যোগ মানেই 'পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি' বা 'দুষ্টচক্রের পুঁজিবাদ' নয়। কিন্তু একের পর এক আর্থিক কেলেংকারি উদঘাটনের পর ক্যাগের বক্তব্য : "সরকারের ভাবমূর্তি অত্যন্ত খারাপ। এধরনের যৌথ উদ্যোগেও বিশেষ অডিট প্রয়োজন। ক্যাগ

এসব নিয়ে খতিয়ে দেখতে আগ্রহী।'' ক্যাগের এই উৎসাহকে কটাক্ষ করে কেউ কেউ এই স্বশাসিত নিয়ন্ত্রক সংস্থার অতিসক্রিয়তাকে দমাতে চেয়েছেন, পাছে এ নিয়ে বিতর্কে ফের সরকার জড়িয়ে না পড়েন।

কিন্তু ঘটনা হলো, ক্যাগের এই আগ্রহ কিছু অমূলক নয়। গত জানুয়ারিতে এবং ফের এই অক্টোবরে দেশের শিল্পজগতের দিকপাল অগ্রণী শিল্পপতিরা প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে সরকারি পর্যায়ে মন্ত্রী আমলাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ করে যৌথভাবে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। তাতে লেখা হয়েছে : ''কতিপয় কর্পোরেট-রাজনীতিকের দুষ্টচক্রে দেশে দুর্নীতি সর্বব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে। অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে পড়েছে যে দেশের শিল্পপতিদের এখন লগ্নি করতে হচ্ছে বিদেশে।'' পুঁজির পৃষ্ঠপোষকরাও সাম্প্রতিককালের একের পর এক কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসায় হাঁফিয়ে উঠেছেন। এদেশের রাজনীতিতে দুষ্টচক্রের পুঁজিবাদের কুপ্রভাব নিয়ে রিপোর্ট বেরিয়েছে আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনেও। আসলে বিশ্বপুঁজির নিয়ন্ত্রক যাঁরা তাঁরাও অনুভব করতে শুরু করেছেন যে দুষ্টচক্রের পুঁজিবাদ কতিপয় কর্পোরেটের স্বার্থে গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। আর এই প্রক্রিয়ায় ফুলে-ফেঁপে উঠছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভাণ্ডার ও এক শ্রেণীর নেতা ও মন্ত্রী।

ফুলছে নেতা-মন্ত্রীর দল ঃ

ইলেকশান ওয়াচ এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রেটিক রিফর্মস (এডিআর) এর তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদনেও ফুটে উঠেছে এসব তথ্যের প্রতিফলন। ক্যাগ বা সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের মন্তব্যগুলি ঐ প্রতিবেদনের পাশে রেখে বিশ্লেষণ করলে এ নিয়ে ধারণা আরও স্পষ্ট হবে। মনমোহন মন্ত্রিসভায় সব থেকে বড় ধনী প্রফুল্ল পটেল। কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী ছিলেন তিনি। তিনি মন্ত্রী থাকাকালীন এয়ার ইন্ডিয়া ক্রমশ খরচের বোঝায় ন্যুব্জ হয়ে পড়ে। আর লাভজনক রুটগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বাড়তে থাকে বেসরকারি সংস্থার উড়ান। বেসরকারি সংস্থাগুলি যখন নানা সহজ শর্তে উড়ানের অনুমতি পেয়েছে তখন এয়ার ইন্ডিয়ার ঘাড়ে চেপেছে শত শত কোটি টাকার বিমান কেনার ফরমান। নানাভাবে এয়ার ইন্ডিয়া যখন মুখ থুবড়ে পড়ছে, তখন মন্ত্রীর রোজগার বেড়েছে অবিশ্বাস্য গতিতে। ২৮ মাসের মন্ত্রীত্বকালে প্রফুল্লের সম্পত্তি বেড়েছে ১২২ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতিদিন তাঁর সম্পত্তি বেড়েছে ৫ লাখ টাকা! তাঁর এই হঠাৎ সম্পত্তি বৃদ্ধির কারণ বা উৎস কী, তা জানানো হয়নি নির্বাচনী এফিডেভিটে।

একইভাবে নজরে পড়েন কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সম্প্রচারের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডিএমকে নেতা জগৎরক্ষকণ; মাত্র দু বছরে তাঁর রোজগার বেড়েছে ৬৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাসে আড়াই কোটিরও বেশি।

তথ্য-প্রযুক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রী মিলিন্দ দেওরাই বা কম যান কীসে; গড়ে প্রতিদিন তাঁরও আয় বেড়েছে ১ লাখ টাকা করে! নগর উন্নয়নমন্ত্রী কমলনাথের সম্পদ দুবছরে বেড়েছে ২৬ কোটি টাকা। তাঁর পারিবারিক সম্পত্তির পরিমাণ ১৭৬ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে! প্রধানমন্ত্রীর অফিস থেকেই এইসব তথ্য জানা গেছে। আরও জানা গেছে যে এদেশের ৭৭% শতাংশ মানুষ যখন দারিদ্র্যসীমার নীচে, তখন মনমোহনের মন্ত্রিসভার ৭৭% মন্ত্রীই কোটিপতি। গত দুবছরে মন্ত্রীদের আয় বেড়েছে গড়ে তিন কোটি টাকা করে। এডিআর সূত্রে জানা গেছে, কংগ্রেসের বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী পানাবাকা লক্ষ্মীর সম্পদ বৃদ্ধির হার ৮২৮ শতাংশ। পরিবহন ও সড়ক দফতরের প্রতিমন্ত্রী তুষারভাই চৌধুরীর সম্পদ বেড়েছে ৭০৫ শতাংশ।

সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার, মনমোহনের মন্ত্রিসভার ৭৭ জনেরর মধ্যে ৩৯ জনেরই শেয়ার বাজারে বেশ ভাল লগ্নি আছে। আইনে এ নিয়ে স্পষ্ট কোন আপত্তি নেই, কিন্তু নৈতিকতার বিচারে এটা ভীষণভাবে অনভিপ্রেত। এ নিয়ে পশ্চিমী দেশগুলির মতো এ দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের উপরেও কড়া বিধিনিষেধ জারি করা উচিত। আমাদের সাংসদ-মন্ত্রীরা আচরণ বিধি মানেন না। না মানলেও কিছু করা যায় না, আইন তাঁদের পক্ষে। অনেকসময়ই মন্ত্রীর সিদ্ধান্তে কোন সংস্থার শেয়ারের দাম কমে বা পড়ে। সেখানে তাঁদের ওইসব শেয়ারে লক্ষ লক্ষ টাকার লগ্নি যথেষ্ট সন্দেহজনক। ক'দিন আগেই সেবি-র এক ডেপুটি কর্তা এই মর্মে অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ আনেন যে প্রণববাবু নিজের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে শেয়ার বাজারের দাম ওঠা-নামা করাচ্ছেন এবং তা থেকে লাভ করছেন। প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে প্রণববাবু ওই মন্তব্যকে 'পাগলের মন্তব্য' বলে উড়িয়ে দেন, কিন্তু যে প্রশ্নটা উড়িয়ে দিতে পারেন নি তা হলো মন্ত্রীরা যে শেয়ার বাজারের কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করছেন, বাজারের ওঠানামায় তাঁদের ভূমিকা কী?

এই যখন নেতা-নেত্রী-মন্ত্রীদের অবস্থা তখন তাদের দলের সমৃদ্ধি কেমন তা একবার দেখে নেওয়া যাক। তথ্য অধিকার আইনে জানা গেছে দেশের মানুষ যখন তীব্র মূল্যবৃদ্ধিতে নাকাল, খাদ্য-স্বাস্থ্য-চিকিৎসা-শিক্ষার খরচ জোগাতে দারিদ্র্যসীমার নীচে তলিয়ে যাচ্ছেন, তখন এদেশের রাজনৈতিক দলগুলি ফুলে ফেঁপে উঠছে অস্বাভাবিক আয় ও সম্পদবৃদ্ধিতে। ২০০৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত টানা ছ'বছর দেশের ক্ষমতায় থাকায় আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির হারে শীর্ষস্থানে কংগ্রেস। ২০০২ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে মোট আয় বেড়েছে কংগ্রেসের ১ হাজার ৫১৮ কোটি টাকা, বা ৪২ শতাংশ।

এরপরেই রয়েছে বিজেপি এবং বিএসপি। একই সময়ে এই দুই দলের আয় যথাক্রমে ৭৫৪ কোটি এবং ৩৫৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে শুধু ২০০৯-২০১০ অর্থবর্ষে এই দুই দলের আয়

যথাক্রমে ২২০ কোটি টাকা এবং ১৮২ কোটি টাকা। সম্পদও বেড়েছে সমান তালে। বিজেপি সম্পদ বাড়িয়েছে ২৮৬ কোটি টাকায়। বিএসপি-র সম্পদ বেড়েছে ৫৯, শারদ পাওয়ারের এনসিপি-র ৫১% এবং মুলায়মের সমাজবাদী পার্টির ৪৪%। সংসদীয় বামগুলির মধ্যে সব থেকে এগিয়ে সিপিএম। ২০০২ থেকে ২০০৯ সালের একটি বড়ো অংশে তারাও কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন সরকারের সমর্থক হিসেবে শাসকবৃত্তেই ঘোরাফেরা করেছে। সিপিএম ২০০২-২০০৯এর মধ্যে আয় করেছে ৩৩৯ কোটি টাকা, সম্পদ তৈরি করেছে ১৮৫ কোটি টাকার। সিপিআইয়ের আয় বেড়েছে তুলনায় সামান্যই, মাত্র ৭ কোটি টাকা।

চলছে 'রাজনীতির ব্যবসা'

দলগুলির এই আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির উৎস কী? বেশিরভাগই হিসেবে যা দেখিয়েছে তা হলো তাদের তহবিলে জমা পড়েছে কোটি কোটি টাকার চাঁদা বা অনুদান। কারা দিয়েছে? বিভিন্ন কর্পোরেটরা। কংগ্রেসের আয়কর রিটার্ন পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, তাঁদের দানের তালিকায় রয়েছে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন নামী কর্পোরেটের লম্বা তালিকা। উল্লেখযোগ্য, তাদের মধ্যে রয়েছে বেদান্ত-কেয়ার্নর্স ও অন্যান্য নানা সংস্থা, যাদের বিরুদ্ধে জমি-খনিতে অবৈধভাবে বা নিয়মবহির্ভূত প্রচুর সুযোগ পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে এই সুযোগগুলি এসেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় গৃহীত নানা সরকারি সিদ্ধান্তের হাত ধরেই। রাজনৈতিক দল ও নেতা-মন্ত্রীদের আয়-সম্পত্তি নিয়ে যে দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এদেশে সব থেকে বেশি সক্রিয় এবং সরব তাদের বিবৃতিতে অবশ্য এই হিসেবের স্বচ্ছতা এবং গৃহীত নানা দান ও আয়ের উৎস নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।

দুঃখের ব্যাপার, ব্যক্তি বা কর্পোরেটের আয় ও সম্পত্তির সত্যতা যাচাইয়ের চালু আইনগুলি রাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে একইভাবে প্রযুক্ত হয়না। রাজনৈতিক দলগুলি কীভাবে কাজকর্ম চালাবে তা নিয়ে সব উন্নত গণতন্ত্রেই বিস্তারিত আইন আছে। নেই এই ভারতে। এই নিয়ে বহুবারই নানা পক্ষ থেকে প্রস্তাব এসেছে। ল' কমিশন অব ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল কমিশন ফর দি রিভিউ অফ দি ওয়ার্কিং অফ কনস্টিটিউশন এবং নির্বাচন কমিশন এই নিয়ে আইন আনার প্রস্তাব দিলেও এইসব মন্ত্রী-সাংসদ আইন প্রণেতারা তাতে সাড়া দেননি। ফলে এদেশে দল ও নেতা-মন্ত্রীদের আয় ও সম্পত্তির উৎস খুঁজতে গেলে স্পষ্ট কোনও সর্বজনগ্রাহ্য মানদণ্ড বা সর্বজনে বলবৎযোগ্য আইন নেই। এক্ষেত্রে দলগুলি বা নেতামন্ত্রীরা যা বলেন তাই শিরোধার্য করতে হয়। চন্দ্রবাবু নাইডু যেমন জানিয়েছেন যে হায়দরাবাদের সব থেকে দামি এলাকা জুবিলি হিলে তাঁর দশহাজার বর্গফুট বাড়িটির দাম মাত্র প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা। তাই-ই মানতে হবে।

এই যখন দেশের অবস্থা এই রাজ্যের অবস্থাটা কী? এরাজ্যেও ক্ষমতায় থেকে সম্পদের পাহাড় গড়েছেন সিপিএম নেতারা, এমন একটি অভিযোগ নানা সংবাদমাধ্যমে অনেকবারই প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষমতায় থাকা বা না-থাকাটা রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের কাছে আয় বা সম্পদবৃদ্ধিতে এখন গৌণ, জানিয়েছে দি হিন্দু পত্রিকা'। ১৭ এপ্রিল, ২০১১ *দি হিন্দু*-তে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ রাজ্যের বিধানসভার সাম্প্রতিক নির্বাচনে কেবলমাত্র দ্বিতীয় দফায় ভোটে দাঁড়ানো প্রার্থীদের আয় ও সম্পত্তির হিসেবে দেখা যাচ্ছে ২০০৬-র পর থেকে ২৮ জন বিধায়কের সম্পত্তি বেড়েছে ১২০%। আর যারা জেতেননি তারাও এ ব্যাপারে খুব একটা পিছিয়ে নেই। প্রার্থীদের জমা দেওয়া নির্বাচনী এফিডেভিট বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা নিজেরাই জানিয়েছেন যে গত ৫ বছরে তাঁদের সম্পত্তি বেড়েছে ২ থেকে ৩ গুণ। ভোট জেতা মানেই যেন পরশপাথর খুঁজে পাওয়া, এ রাজ্য থেকে সাংসদ হয়েছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে দশজন কোটিপতি— সকলেই তৃণমূল বা কংগ্রেসের।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এই অবক্ষয়ী রাজনৈতিক অনুশীলনের কারণ খুঁজতে গিয়ে বর্তমান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরম ২০০৪ সালে ১৮ এপ্রিল *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে* তাঁর কলমে লিখেছিলেন : রাজনৈতিক ক্ষমতাটাই হলো রাজনৈতিক দলগুলির মূলধন, ক্ষমতা ভাঙিয়েই বাড়াতে হয় আয়। এটা করতে পারলেই রাজনীতিতে শক্তিশালী হওয়া যায়। দল-নেতা সকলেই এটা করেন।

রাজনৈতিক দলগুলির পরিচালনা নিয়ে কোনও সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই বলেই রাজনীতি ক্রমশ হয়ে উঠেছে নীতিহীন। দায়বদ্ধতা ও স্বচ্ছতার বাতাবরণ যেখানে দ্রুত অপসৃত হয়ে স্থান নিয়েছে ধান্দাবাজির কৌশল। এদেশের এই সময়ে সংসদে ১৫৩ জন সাংসদের বিরুদ্ধে রয়েছে ফৌজদারি অভিযোগ, যার মধ্যে ৭৪ জনের বিরুদ্ধে রয়েছে খুন ও অপহরণের মতো গুরুতর অভিযোগ। মজার কথা, আইনে গুরুতর অপরাধ করেও মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রী হতে বাধা নেই। অভিযোগ উঠলে বা অভিযোগের তদন্ত হলেও তো মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে হয় না। তদন্ত কমিশন বসেছে, এফআইআর হয়েছে, চার্জশিটও তৈরি হয়েছে, তারপরেও মন্ত্রী ক্ষমতায় থেকে গেছেন। বিচার চলছে তাঁরই বিরুদ্ধে, তবু তিনিই ক্ষমতায়। দেশের আইনে এই সুযোগ আছে বলে অনেকেই বেপরোয়া। নব্য পুঁজিবাদ রাজনীতির এই প্রবণতাকেই কাজে লাগাতে চায়। সেই কারণেই নির্বাচনী সংস্কারের অনেক প্রস্তাব জমা পড়লেও কোনটিই কার্যকর করতে এগিয়ে আসেনি সাংসদরা। সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনের প্রাক্তন কমিশনার এন ভিট্টল বললেন : ''দুর্নীতি দূরীকরণে আমরা আইডিয়া আছে অনেক। কিন্তু জানি ভারত সরকার তার একটারও প্রয়োগ করবে না।'' (*দি হিন্দু*, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১১) রাজনীতিক-কর্পোরেটদের অশুভ আঁতাত এদেশের গণতন্ত্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছে।

প্রবন্ধ

আধার— কার লাভ, কার ক্ষতি?

সমরেশ মিত্র

মহারাষ্ট্রে চাপেকার ভ্রাতৃবৃন্দ র‍্যান্ড সাহেবকে গুলি করে হত্যা করে ইংরেজ রাজত্বকে চ্যালেঞ্জ জানান এক শতাব্দী আগে। র‍্যান্ড সাহেব পুনেতে প্লেগ রোগীদের চিহ্নিতকরণ শুরু করেছিলেন ভারতীয় নারী-পুরুষদের নগ্ন করে প্রকাশ্য রাস্তায় হাঁটিয়ে। এই অবমাননাকর অবস্থার প্রতিবাদে দেশপ্রেমিক চাপেকার ভ্রাতৃবৃন্দ র‍্যান্ড সাহেবকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে সাম্রাজ্যবাদীদের ফাঁসির দড়িতে শহিদ হন।

ইতিহাসে শুনেছি ঘটনা চক্রাকারে ফিরে আসে; কখনও কৌতুক হিসাবে, কখনও বিয়োগাত্মক দ্যোতনা নিয়ে। ২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহারাষ্ট্রের টেম্বলি গ্রামে বিশ্বব্যাংকের প্রাক্তন কর্মচারী বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এবং ইতালীয় নাগরিক বর্তমানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ব্রিটিশ রাজপুরুষ হিউম সাহেব) সভানেত্রী শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধী এক অভিনব প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন।

এই অভিনব প্রকল্পটি হলো প্রতিটি ভারতীয় নাগরিককে দেশের মধ্যে নির্ভুলভাবে চিহ্নিতকরণের জন্য নাগরিকের অনন্য বৈশিষ্ট্যচিহ্ন যুক্ত এক সচিত্র পরিচয়পত্র, সাহেবরা যার নাম দিয়েছে 'ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন কার্ড'। জাতীয়তাবাদী প্রধানমন্ত্রী মোলায়েম করে এই সচিত্র পরিচয়পত্রের নাম দিয়েছেন 'আধার'। যে চিহ্নিতকরণ পদ্ধতির প্রতিবাদের চাপেকার ভ্রাতৃবৃন্দ শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন, আমাদের জাতীয়তাবাদী প্রধানমন্ত্রী সেই চিহ্নিতকরণকেই ফিরিয়ে আনতে চলেছেন— হয়ত এটাই ইতিহাসের বিয়োগাত্মক পরিণতি।

বিষয়টি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণের আগে আমরা বুঝে নিই এই 'আধার' প্রকল্পটি আসলে কী বস্তু। এর পেছনে কী লুকিয়ে আছে তা নিয়ে আলোচনা তার পর হবে।

ভারত-মার্কিন সহযোগিতা চুক্তি (২০০৫)-র পর থেকে মার্কিন সরকারের দুনিয়াব্যাপী 'সন্ত্রাসবাদ বিরোধী জেহাদ'-এর অংশীদার হয়েছে ভারত সরকার। তারপর ভারত সরকারের মনে হয়েছে যে, দেশের মানুষের ভালোমন্দ-র খোঁজখবর নেওয়া এবং দেশের অভ্যন্তরে 'সন্ত্রাসবাদীদের' দ্রুত চিহ্নিত-করণের জন্য যাবতীয় ভারতীয় নাগরিকদের এক অনন্য সচিত্র পরিচয়পত্র থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজন এমন পরিচয়পত্র যা জাল করা কঠিন। এই লক্ষ্য মাথায় রেখে ভারত সরকার যোজনা কমিশনের তত্ত্বাবধানে 'ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া' গঠন করার জন্য একটি খসড়া বিল মুসাবিদা করেছে। বিলটি এখন খসড়া স্তরেই রয়েছে, কিন্তু সংস্থাটি তার কাজ শুরু করে দিয়েছে।

এই সংস্থার কাজ হবে ভারতের প্রতিটি নাগরিক এবং ভারতে বসবাসকারী প্রতিটি মানুষের ছবি, হাতের আঙ্গুলের ছাপ, চোখের মণির সূক্ষ্ম ছবি সহ অন্যান্য আরও কয়েকটি ব্যক্তিগত তথ্য নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার গড়ে তোলা, যার সঙ্গে যোগ হবে বর্তমানে যে সমস্ত তথ্যভাণ্ডার রয়েছে (যেমন ব্যাংকে প্রদত্ত তথ্য, মোবাইল সংস্থাকে প্রদত্ত তথ্য, আয়করকে প্রদত্ত তথ্য, শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রদত্ত তথ্য, সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্রে প্রদত্ত তথ্য ইত্যাদি), এমন ২১টি তথ্যভাণ্ডারের তথ্য।

সরকারের দাবি হলো, অনন্য বৈশিষ্ট্যসূচক জাল-নিরোধক এই পরিচয়পত্র "সরকারকে সামাজিক দুর্নীতির মূল খুঁজে বের করে তাকে নির্মূল করতে প্রভূত সাহায্য" করবে। এর ফলে দেশের গরিব মানুষরা এমন এক পরিচয়পত্র পেয়ে যাবেন যার ফলে তাঁরা এখন অনেক সহজে সরকারের কল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে সাহায্য ও ভরতুকি দ্রুত নিশ্চিন্তে পেতে পারবেন। সরকার তার নিজস্ব অর্থকোষ থেকে খরচ করে নিজ দায়িত্বে দেশের মানুষকে এই সুবিধে দিতে বদ্ধপরিকর এবং এই কাজ সম্পন্ন করার জন্য বিজ্ঞাপন, প্রচার এবং পরিচয়পত্র তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করার জন্য একটি সংস্থাও খাড়া করে ফেলেছে।

কিন্তু এই উদ্যোগ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে— শুধু ভারতেই নয়, পৃথিবীর যেখানে যেখানে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেখানেই এই উদ্যোগ শেষ পর্যন্ত শুরু হয়েছে খুবই তাড়াহুড়ো করে এবং অন্যান্য দেশের নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থেকে বিন্দুমাত্র শিক্ষাগ্রহণ না করে, সেই পুরনো পথে আরও অসতর্ক পদক্ষেপ ফেলা হচ্ছে।

প্রথমত, এই উদ্যোগে যাঁরা সামিল হবেন তাঁদের ভাগ্যে জুটবে কয়েদিদের মতো একটি সংখ্যামাত্র, রবীন্দ্রনাথ যে পদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করে তাঁর রক্তকরবী কাব্যনাট্যে শ্রমিকদের চিহ্নিত করেছিলেন ৬৯ঙ বা ৪৭ফ ধরনের নামে। এই সংখ্যা নেওয়া বা না নেওয়া আপাতত আবশ্যিক নয়, কিন্তু যে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি এই বিশাল কর্মকাণ্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত, তারা ভারতের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থান, যেমন পেনশন, মাস মাইনে, ইন্দিরা যোজনা, বিধবা ভাতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী ভাতা ইত্যাদির সঙ্গে যোগাযোগ করে বলেছে যে ২০১২-র এপ্রিলের পর থেকে এই সংস্থাগুলি যেন আধার সংখ্যা ছাড়া কোনও পরিচয়পত্র গ্রহণ না করে। যদিও বলা হচ্ছে যে ভারতীয় নাগরিকদের এই পরিচয়জ্ঞাপক সংখ্যা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু বিষয়টাকে এমনভাবে সাজানো হচ্ছে, যাতে এই সংখ্যাটি গ্রহণ

করা শেষ পর্যন্ত নাগরিকদের জন্য আবশ্যিক হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশে যে যে বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এখনে সেগুলো এক এক করে আলোচনা করা যাক। প্রথমত, যে খসড়া বিলটির ফলে জাতীয় সংস্থাটি গড়ে ওঠার কথা, সেই বিলটিই এখনও পর্যন্ত বিধিসম্মত উপায়ে সংসদের উভয় কক্ষে পাস হয়নি। অথচ বিলটির খসড়া প্রস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ২০০৯ সালে সংস্থা গঠন করে তার কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে এই বিল এবং বিল পাস হওয়ার আগেই বেআইনিভাবে গঠিত সংস্থাটি গঠন ও তার ক্রিয়াকলাপ নিয়ে অন্তত তিনটি মামলা থাকলেও সংস্থাটির কাজ (বেআইনিভাবে) অব্যাহত আছে। এই অসংবিধানিক সংস্থাটি ইতিমধ্যেই জনগণের করের টাকা থেকে ৩০০০ কোটি টাকা খরচ করে ফেলেছে; অর্থের অভাবে বন্যাত্রাণ, রোজগার যোজনার বরাদ্দ নিয়ে টালবাহানা চললেও এই সংস্থার খরচের জন্য ১.৫ লক্ষ কোটি টাকা রাখা আছে।

ঘুষ আর দুর্নীতির আখড়া আমাদের এই পোড়া দেশে এত টাকার খেলা যেখানে জমে উঠেছে সেখানে 'কাট মানি' ইত্যাদি থাকবে না এ তো হতে পারে না। তাই আমরা দেখি যে ২০০৯ সালে নির্মিত প্রকল্পে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় মানুষের হাতের ছাপ ও চোখের মণির ছবি তোলার যে যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছিল এবং সেই সমস্ত ছবিকে প্রয়োজনীয় তথ্যে রূপান্তরিত করে তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য (বেশ কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে) যে কম্পিউটার প্রোগ্রাম কেনা হয়েছিল, আজ মাত্র দু বছর পর, ২০১১ সালে আবার কয়েকজন আমলা, যারা এ বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা দক্ষ বলে পরিচিত নন, তাঁদের একক সিদ্ধান্তে বাজার থেকে টেন্ডার ছাড়াই নতুন এক কম্পিউটার প্রোগ্রাম কেনা হলো। এই নতুন কেনা প্রোগ্রাম আবার দুবছর আগে কেনা যন্ত্রপাতিতে তোলা ছবি ইত্যাদি পড়তে পারে না, ফলে আবার একদফা নতুন যন্ত্রপাতি কেনার বরাত দেওয়া আসন্ন। এর দায়িত্ব নিয়েছে যোজনা কমিশন। শুধু তাই নয়, পুরনো যে তথ্যভাণ্ডার ২০০৯ সাল থেকে গড়ে তোলা হচ্ছিল সেই তথ্যভাণ্ডারকে নতুন তথ্যভাণ্ডারের আদলে গড়ে নেওয়ার জন্য নতুন উদ্যোগ শুরু হয়েছে। আগেই বলেছি, যাঁরা এই সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছেন এবং নিচ্ছেন তাঁরা সংবিধান-সম্মত কোনও সংস্থা নন, তাঁদের দেশের আইন মোতাবেক টেন্ডার ডাকার পদ্ধতি মানছেন না, সম্পূর্ণ গোপনে এত টাকার লেনদেন সেরে নিচ্ছেন। পুরোপুরি স্বচ্ছতার অভাবই হলো এই প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্য। যতদিন না নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ির ফলে টু-জি স্পেকট্রাম বা কমনওয়েল্থ গেমসের মতো আর্থিক কেলেংকারি প্রকাশ হচ্ছে, এই বেআইনি লেনদেন, বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের পরিমাণটি জানার জন্য ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

এইবার আমরা আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার দিকে চোখ ফেরাব। মার্কিন দেশে বড় বুশ ও ছোট বুশ বার দুই চেষ্টা করে মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি (অর্থাৎ, হাতের ছাপ, চোখের মণির ছবি ও অন্যান্য শারীরতত্ত্বীয় তথ্যের ওপর নির্ভরশীল চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি) সেখানে চালু করতে ব্যর্থ হয়েছেন মূলত দুটি কারণে। এক, প্রযুক্তিটি সম্পূর্ণ পরীক্ষিত নয়, দুই, সেদেশের মানুষের এ বিষয়ে নেতিবাচক অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁরা তীব্র প্রতিবাদ করে প্রকল্পটি মাঝপথে থামিয়ে দিয়েছেন। দুশো বছরের ইংরেজ শাসনের অধীনে থেকে ভারতের শাসকদের মনে বিলাতি বিষয়ের ওপর রয়েছে অশেষ ভক্তি এবং অনিঃশেষ প্রেম। তাই ইংল্যান্ডের ব্যাপারটি জানা-বোঝা জরুরি। ইংল্যান্ডের যে এনআইডি প্রকল্পের আদলে 'আধার' প্রকল্পটি গঠিত, সেই এনআইডি প্রকল্পে ২০০২ সালে ইংল্যান্ড ২৫০ কোটি পাউন্ড-স্টারলিং বরাদ্দ করে এবং প্রকল্পটি আট বছরে শেষ করার কথা ভাবে। দু বছরের মাথায় দেখা যায় যে এই কাজ করার জন্য যে প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে, সেই প্রযুক্তিটি এখনও যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। বার দুই প্রযুক্তি বদল করার পর মাত্র ৫ শতাংশ কাজ নির্ভুলভাবে করা সম্ভব হলে ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হয়। এই আট বছরে ৪৫০০ কোটি পাউন্ড স্টারলিং খরচ হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। মজার বিষয় হলো, ২০০২ সালে গ্রহণ করা যে প্রযুক্তি ইংল্যান্ড ২০০৬ সালে পরিত্যাগ করে, ভারত সরকার চারগুণ দাম দিয়ে টেন্ডার ছাড়াই, রক্ষণাবেক্ষণের কোনও চুক্তি ছাড়াই সেই প্রযুক্তি ২০০৯ সালে বাজার থেকে কেনে। আবার ২০১০ সালে যে প্রযুক্তি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করে ইংল্যান্ড সিদ্ধান্তে আসে যে এমন প্রযুক্তি দিয়ে আপাতত শারীরবৃত্তীয় তথ্যভাণ্ডার গড়া অসম্ভব, ২০১১ সালে ভারত সরকার আবার সেই প্রযুক্তিটিও কিনেছে!

হবু চন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীমণ্ডলী পরিবৃত দেশে, আমাদের এই ভারতবর্ষে 'সন্ত্রাস' এবং 'দুর্নীতি' দিয়ে সরকারের যে কোনও সন্দেহজনক পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করা যায়। 'আধার' প্রকল্পে এই উপাদানটি থাকলেও তার শিকড় আরও গভীর এক রাজনৈতিক ব্যাখ্যার মধ্যে নিহিত রয়েছে। আমরা এখন সেই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় যাব।

বলে নেওয়া ভালো, যে সব তথ্যের ভিত্তিতে এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, তা কেবলমাত্র এক হিমশৈল-র চূড়া— কিন্তু চূড়াটিই এমন সাংঘাতিক ইঙ্গিতবাহী যে, জলের তলায় নিমজ্জিত অংশটি যে ভারতবাসীর জন্য কী অশনি সংকেত বহন করছে তা ভবিষ্যতই বলবে।

ইহুদি নিধন যজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য জার্মানিতে হিটলার প্রথম জার্মান নাগরিকদের জন্য অনন্য বৈশিষ্ট্যসূচক পরিচয়পত্র চালু করে। এই পরিচয়পত্র অনুসারে হিটলার প্রথমে নিখুঁতভাবে ইহুদিদের চিহ্নিত করে প্রথমে তাদের হলুদ ফিতে পরতে বাধ্য করে, যাতে তাদের সর্বদা আলাদা করে সনাক্ত করা

সম্ভব হয়। এরপর ঐ হলুদ ফিতের ওপর ভিত্তি করে নাৎসি ডাক্তাররা ইহুদিদের কপালে এবং ডান হাতের কব্জিতে একটি অনন্য সংখ্যা খোদাই করে জেয়। পরবর্তী সময়ে এই সংখ্যার ভিত্তিতে গ্যাস চেম্বারে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপে গ্যাস চেম্বারে বেশ কয়েক কোটি ইহুদি নিধন যজ্ঞ চালায় নাৎসি বাহিনী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিদের পরাজয়ের পর ইউরোপ এবং মার্কিন দেশ কমিউনিজমের জুজু দেখতে থাকে সর্বত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জাতি-বিদ্বেষী ও মার্কিন দেশে জাতিগত দাঙ্গা বাধানোর নায়ক সেনেটার মাকার্থি 'আন-আমেরিকান অ্যাকটিভিটি' বা মার্কিন প্রশাসন বিরোধী কার্যকলাপ রোধে ধরে ধরে বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণের কাজ শুরু করে। চার্লি চ্যাপলিনকে হলিউড ছাড়তে হয়। সারা দেশ জুড়ে জাতিবিদ্বেষের জোয়ার বইয়ে দেওয়া হয়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময়, ফ্রান্সে ছাত্রবিক্ষোভ ইত্যাদি যখন তুঙ্গে, তখনও নাগরিকদের কার্যকলাপের ওপর নজরদারি করার জন্য প্রশাসন নানা রকম ব্যবস্থা নেয়। বর্তমানের ওবামা প্রশাসন তথাকথিত ই-গভর্নেন্স করার জন্য সে দেশের গোয়েন্দা বিভাগ এফবিআই (সঙ্গে যোগ দিচ্ছে কুখ্যাত সিআইএ) সে দেশের মুসলিম নাগরিকদের হাতের ছাপ, চোখের মণির ছবি, রক্তের নমুনা ইত্যাদি বেআইনিভাবে সংগ্রহ শুরু করে দিয়েছে। উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে ভিড়ের মধ্য থেকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে চিহ্নিতকরণের কাজও সহজ হয়ে গেছে।

আমাদের দেশে চিদাম্বরম সাহেব প্রতিরক্ষামন্ত্রী হয়ে নাগরিকদের নিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়াটিকে জাতীয় অপরাধ নিরাপত্তা ব্যুরো-র সমার্থক করে তুলেছেন। নাগরিকদের জাতীয় তথ্য এখন স্থানীয় থানার মাধ্যমে সংগৃহীত হবে। গত ১৮ অক্টোবর ২০০৯ দিল্লীতে এক সভায় চিদাম্বরম মন্তব্য করেছেন, এই অনন্য সংখ্যাকে তিনি দেশের 'ক্রাইম অ্যান্ড ক্রিমিনাল ট্রেকিং নেটওয়ার্ক-এর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চান, কেননা ইন্দো-মার্কিন সমঝোতা চুক্তি মতে ভারত সরকার, মার্কিন দেশের 'সন্ত্রাস-বিরোধী' জেহাদের অংশীদার হয়ে উঠেছে। যারা বেআইনিভাবে চলা এই জাতীয় সংস্থাটিতে কর্মরত, চিদাম্বরম তাদের বলেছেন যে ''মার্কিন দেশে যদি জাতীয় সন্ত্রাস বিরোধী কেন্দ্র থাকতে পারে তবে ভারতে তা থাকবে না কেন। আমি আশা রাখি যে আপনাদের কর্মদক্ষতা এবং বিদেশি প্রযুক্তির সাহায্যে আপনারা দেশকে একটি সুষ্ঠু, সন্ত্রাসবিরোধী, প্রশাসন বিরোধী কার্যকলাপ নিরোধক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রদান করবেন।''

চিদাম্বরমের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতি রেখেই জাতীয় সংস্থাটি এই বিরাট কর্মকাণ্ড কমানোর জন্য তিনটি সংস্থার একটি কনসর্টিয়ামকে বরাত দিয়েছে। সেই তিনটি সংস্থা হলো অ্যাকসেনচিওর, মাহিন্দ্রা-সত্যম-মরফো এবং এল-১ আইডেন্টিটি সলিউশন। অ্যাকসেনচিওর সংস্থাটি ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে মার্কিন দেশের আরকানসাস প্রদেশের একটি আদালতে ঘুষ দেওয়া, বরাত পাওয়ার জন্য মূল্য নিয়ে কারচুপি করা ইত্যাদি ১৪টি আর্থিক কেলেংকারিতে দোষী প্রমাণিত হলে তারা আদালতের বাইরে মামলাটি মিটিয়ে নেয় এবং মামলাকারী সংস্থাগুলিকে ৬.৩৭ কোটি মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়। মাহিন্দ্রা-সত্যম-মরফো এখনই অভিযোগ করেছে যে, ভারতের যোজনা কমিশনে প্রভাব খাটিয়ে অ্যানসেনচিওর প্রতি দশটা আঙ্গুলের ছাপের পাঁচটার বরাত হস্তগত করেছে। সত্যম-এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আর্থিক কেলেংকারির কথা এখনও ভারতের মানুষ ভুলতে পারেননি।

তবে আসল কাহিনীটি লুকিয়ে আছে এল-১ আইডেন্টিটি সংস্থাটির কার্যকলাপের মধ্যে। এই সংস্থাটি মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। এই সংস্থার বোর্ড অফ ডিরেক্টরের সিংহভাগই হলো সিআইএ সংস্থার প্রাক্তন ডিরেক্টর। এই সংস্থাটি অতীতে ইরাক, আফগানিস্থান, লিবিয়া এবং টিউনিশিয়ায় সিআইএ-র হয়ে প্রযুক্তিভিত্তিক গোয়েন্দাগিরি (অর্থাৎ হোটেল থেকে ব্যবহৃত গেলাস এনে সেখানে হাতের ছাপ, চুমুকের দাগ তুলে নেওয়া ইত্যাদি) করেছে। এমনকি লিবিয়ায় সম্প্রতি গদ্দাফি-বিরোধী আন্দোলনে যারা বামপন্থী তাদের বিশেষ পদ্ধতিতে তাদের চিহ্নিতকরণের যন্ত্রপাতি ও কম্পিউটার প্রোগ্রামও এই সংস্থাই সিআইএ-কে সরবরাহ করেছে। মার্কিন সমরাস্ত্র ব্যবসায়ী, যুদ্ধবাজ লবি এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধে গেরিলা দমনে দক্ষ অফিসাররা এই সংস্থার পরামর্শদাতা। সম্প্রতি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যে নৈশ-দৃষ্টি বা নাইট-ভিশন যন্ত্র সরবরাহ করেছে, সেখান থেকে ভারত-চীন সীমান্তের ছবি সরাসরি এই কোম্পানির তথ্যভাণ্ডারে সংগৃহীত হওয়ার ব্যবস্থা আছে বলে জানা গিয়েছে। এই সংস্থার সঙ্গে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই তার দেশের বাইরের গোয়েন্দা কার্যকলাপের জন্য গাঁটছড়া বেঁধেছে। এই সংস্থাটি বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গোষ্ঠী সম্পর্কে অডিও-ভিস্যুয়াল তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীর নানান দেশকে বিশেষ করে ইজরায়েলকে বিক্রি করে। দেশের মানুষ সম্পর্কে সমস্ত তথ্য এদের হাতে তুলে দেওয়াটা দারুন উচিত কাজই হচ্ছে বটে!

ভারতের জনগণ সম্পর্কে যাবতীয় একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য আজ ভারত সরকার বিদেশি গোয়েন্দা দপ্তরের হাতে তুলে দিতে উদ্যোগী হয়েছে; অন্তত 'আধার' প্রকল্প অবশ্যই সেই অশুভ সংকেতের বার্তাবহ।

আর এই প্রকল্পের ব্যয়ভার? যে ব্যয়ভার দেখে পিছিয়ে গেল কম জনসংখ্যার উন্নত দেশ ইংল্যান্ড, বিপুল জনসংখ্যার আমাদের এই গরিব দেশে সেই ব্যয়ভার যে কত বিপুল হবে, তা নিয়ে কোনও আলোচনা-বিতর্ক ছাড়াই, সংসদকেও একরকম বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শুরু হয়ে গেল প্রকল্পটি, যার বিশাল ব্যয়ভার আসবে আমাদের ভুখা জনতার পকেট কেটে।

অনীক

বার্ষিক সূচিপত্র : ২০১১

সম্পাদকীয় / ঘটনপ্রবাহ / স্মরণ / বিতর্ক /দলিল / পত্রপত্রিকা...
প্রসঙ্গ : 'পরিবর্তন' / সম্পাদকীয় / ১ / জানু-ফেব্রু
দারিদ্র্যের বদলে মহম্মদ ইউনুস কি জাদুঘরে.../ওমর তারেক চৌধুরী/৫/ঐ
প্রসঙ্গ ঃ রাজারহাটে জমি অধিগ্রহণ / প্রণব দে / ২ / মার্চ
ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিস জন্মশতবর্ষ / ৫ / মার্চ
দুর্নীতিতন্ত্র / ৬ / মার্চ
বোমা চক্রান্তের মৌলবাদী বিস্ফোরণ / পরিচয় কানুনগো /১১/মার্চ
মার্কিন মুলুকেও কায়রোর ছায়া / ধারা চট্টোপাধ্যায় ১১/ মার্চ
আরব দুনিয়ায় ঝড় ঃ প্রকৃত তাৎপর্য কী? / সুচরিতা সেন /২১/মার্চ
সাক্ষাৎকার : সামির আমিন / ১৮ / মার্চ
মিশর : বিপ্লবের পটভূমি / দীপ্র চৌধুরী / ২১ / মার্চ
মিশর : স্বাধীন ট্রেড-ইউনিয়নসমূহের ঘোষণা / ২২ / মার্চ
সাম্রাজ্যবাদ এবং লিবিয়ার গণজাগরণ / প্রবীণ রায় / ২৩ / মার্চ
বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর ঘরে ফেরা / মালবিকা মিত্র / ৩৮ / মার্চ
সাম্রাজ্যব্যাদ, লিবিয়া থেকে হাত ওঠাও / সম্পাদকীয় / ১ / এপ্রিল
সাম্রাজ্যবাদ ও লিবিয়া/দীপ্র চৌধুরী/৩ / এপ্রিল
মুখ্যমন্ত্রী সত্যি কথা বলেন নি/দীপ্তি চন্দ্র/৫ / এপ্রিল
অন্য ক্রিকেট/প্রণব দে/৭ / এপ্রিল
স্পঞ্জ আয়রন বৃত্তান্ত/সহদেব মন্ডল/৮ / এপ্রিল
প্রান্তবাসীদের গণ-সমাবেশ/পরিচয় কানুনগো/৯ / এপ্রিল
এপিডিআর-এর নির্বাচনী দাবিপত্র/১০ / এপ্রিল
গণতন্ত্র তুমি কার? / কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় / ২১ / এপ্রিল
আত্মপক্ষ সমর্থনে দু-চার কথা / রতন খাসনবিশ / / এপ্রিল
নির্বাচন ও তার পর / সম্পাদকীয় /১ / মে
পস্কো বিরোধী সংগ্রাম এবং গণতন্ত্র /প্রণব দে / ৩ / মে
দুর্নীতির বিরুদ্ধে... আন্না হাজারে / দামিনী চৌধুরী / ৭ / মে
মিশর-বিপ্লব কোন্ পথে? / দীপ্র চৌধুরী / ৮ / মে
ফুকুসিমা এখন কেমন? / শুভাশিস মুখোপাধ্যায় / ১০ / মে
বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের লড়াই / প্রতিবেদক / ১১ / মে
জলাভূমি সংরক্ষণ আন্দোলনের শহিদ তপন দত্ত / ১ / মে
বিতর্ক: পরিবর্তনের সাত কাহন / শঙ্কর মিত্র, পূর্ণেন্দু বসু / ৩৯ / মে
জন্মশতবর্ষে ফয়েজ / ধারা চট্টোপাধ্যায় / ৩০ / মে
বামপন্থার সংকট? / সম্পাদকীয় /১ / জুন
মানবাধিকার আন্দোলন ও সরকার... / দীপ্র চৌধুরী / ৪ / জুন
এম এফ হোসেন এবং তসলিমা... / দামিনী চৌধুরী / ৩ / জুন
খোলা চিঠি: হ্যালো নিরুপমবাবু / দীপংকর চক্রবর্তী / ৪ / জুন
জমি ফেরতের বিতর্ক / প্রণব দে / ৫ / জুন
স্মরণ: বাদল সরকার / অরূপ মুখোপাধ্যায় / ৩৯ / জুন
ভারতে রাষ্ট্রীয় দড়ির খেলা / সম্পাদকীয় / ১ / জুলাই
জিতেন মারান্ডিদের ফাঁসির... / প্রণব দে / ২ / জুলাই
পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন এবং জনমতের প্রতিফলন / ৩৮ / জুলাই
ফিরে দেখা :প্যাট্রিস লুমুম্বা / ৩৮ / জুলাই
কৃচ্ছ্রসাধন শুধু গরীবদের জন্য? / ৪০ / জুলাই
সব কিছু ঠিক চলছে / সম্পাদকীয় / ১ / আগস্ট
লিবিয়া নিয়ে মিথ্যাচার চলছেই / দীপ্র চৌধুরী / ২ / আগস্ট
মিশরে বিপ্লব পিছু হটছে? / প্রবীণ রায় /৩ / আগস্ট
বিজ্ঞান, দর্শন ও সমাজ / জয়ন্ত দাস / ২৮ / আগস্ট
বিতর্কের আপাতত অবসান... / মালবিকা মিত্র / ৩১ / আগস্ট
প্রসঙ্গ পরিবর্তন / রণেশ রায় / ৩৩ / আগস্ট
লেখকের জবাব / রতন খাসনবিশ / ৩৬ / আগস্ট
মানবাধিকার আন্দোলন / প্রেমাংশু দাশগুপ্ত / ৪০ / আগস্ট
ভারতে 'মাওবাদ' প্রসঙ্গে / সম্পাদকীয় / ৩ / সেপ্টে-অক্টো
মারুতি-মানেসর প্লান্টে শ্রমিক আন্দোলন/আভাস মুন্সী/৫/ঐ
দশ বছর পরে / ধারা চট্টোপাধ্যায় / ৬ / সেপ্টে-অক্টো
স্বপ্নের দেশ! / দ্বৈপায়ন চৌধুরী / ১১ / জুলাই / সেপ্টে-অক্টো
স্মরণ: রামশরণ শর্মা / শমিতা সরকার / ৭ / সেপ্টে-অক্টো
জেলা মানবাধিকার আদালত গঠন... / ২৯ / সেপ্টে-অক্টো
নভেম্বরের ডাক / সম্পাদকীয় / ১ / নভেম্বর
এই মৃত্যু-উপত্যকা... / মিতা দত্ত / ২ / নভেম্বর
বিষও দেব, ওষুধও দেব:নোভার্টিস/শুভ্রকেতন বসু, মিতা দত্ত/৩/নভেম্বর
সোনি সোরিদের গণতন্ত্র / পরিচয় কানুনগো / ৫ / নভেম্বর
ভূ-রাজনীতির কয়েকটি ঘটনা / ফারুক চৌধুরি / ৮ / নভেম্বর
স্মরণ : নুরুল হুদা মির্জা / ১৩ / নভেম্বর
আলাপ... ও সাজানো সংঘর্ষ / সিডিআরও / ২ / ডিসেম্বর
কিযেনজি-র মৃত্যু-রহস্য! / ট্রেভর সেভ্ল্যাম / ৪ / ডিসেম্বর
কিযেনজির মৃত্যু... / প্রবীণ রায় / ৫ / ডিসেম্বর
পরিবর্তন-এর জঙ্গলমহল... / শ্যামল দাস / ৬ / ডিসেম্বর
এপিডিআর-মেট্রো চ্যানেল বিতর্ক / প্রতিবেদক / ৭ / ডিসেম্বর
আবার ভোপাল / শুভাশিস মুখোপাধ্যায় / ৮ / ডিসেম্বর
পঞ্চায়েতরাজ... / রণেশ রায় / ৯ / ডিসেম্বর
নিউক্লিয়ার জ্বালানি / শুভাশিস মুখোপাধ্যায় / ১১ / ডিসেম্বর
বিদ্যুতের চার্জ বৃদ্ধি ও একটি মিথ্যা গল্প / ১২ / ডিসেম্বর
এই সংগ্রাম কল্পনাকে... / অরুন্ধতী রায় / ১৩ / ডিসেম্বর
স্মরণ : ভূপেন হাজারিকা / ১৪ / ডিসেম্বর
শৈবাল মিত্র স্মরণে / ১৫ / ডিসেম্বর

প্রবন্ধ
আদর্শে ফেরা / অশোক মিত্র / ১৩ / জানু-ফেব্রু
আর নয়, এবার এঁরা বিদেয় হোক/অভী দত্ত মজুমদার/১৫/ঐ
পরিবর্তন'এর প্রেক্ষাপটে অধিকার.../অমিতদ্যুতি কুমার/১৮/জা-ফেঃ
একটা স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর দরকার / কৌশিক সেন / ২৪ / জানু-ফেব্রু
কোন্ পরিবর্তনের মুখে আমরা দাঁড়িয়ে/গিয়াসুদ্দিন/২৫/জানু-ফেব্রু
পরিবর্তন কোন্ পথে / তরুণকান্তি নস্কর / ২৮ / জানু-ফেব্রু
'পরিবর্তন' প্রসঙ্গে কিছু ভাবনা-চিন্তা/তাপস চক্রবর্তী/৩১/জা-ফেব্রু
পরিবর্তন ও তারপর / দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় / ৩৪ / জানু-ফেব্রু
'অপরিবর্তন'-ই যখন পরিবর্তনের গ্যারান্টি/দেবেশ রায়/৩৬/ঐ
'পরিবর্তন' আর পরিবর্তন/দীপাঞ্জন রায় চৌধুরী/৩৮/জানু-ফেব্রু
পশ্চিমবঙ্গে 'পরিবর্তন': দৃষ্টিভঙ্গির সমস্যা/দীপংকর চক্রবর্তী/৪০/ঐ
মানুষের ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করলে.../নব দত্ত/৪৬/জানু-ফেব্রু
মূল লড়াইটা গণতন্ত্রের জন্য / প্রেমাংশু দাশগুপ্ত / ৫০ / জানু-ফেব্রু
পরিবর্তনের মানে / পূর্ণেন্দু বসু / ৫৩ / জানু-ফেব্রু

পরিবর্তনের আড়ালে দক্ষিণপন্থী উত্থান/পার্থ ঘোষ/৫৬/জানু-ফেব্রু
পশ্চিমবঙ্গ কোন্ দিকে মোড় নিতে চলেছে?/পার্থ সারথি/৬০/ঐ
পরিবর্তনকামী আমি / প্রতুল মুখোপাধ্যায় / ৬৬ / জানু-ফেব্রু
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে .../মনোজ ভট্টাচার্য/৬৯/ জানু-ফেব্রু
'পরিবর্তন' প্রসঙ্গে / মহাশ্বেতা দেবী / ৭২ / জানু-ফেব্রু
পরিবর্তন : কিছু ব্যক্তিগত কথা / রতন খাসনবিশ / ৭৩ / জানু-ফেব্রু
রাজনীতি পরিবর্তন কথা / শুভেন্দু দাশগুপ্ত / ৭৬ / জানু-ফেব্রু
পরিবর্তন-এর স্বরূপ ও পশ্চিমবঙ্গবাসীর সংকট/সুকান্ত রায় /৭৯/ঐ
বাণী তব ধায়— 'পরিবর্তন চাই' / সাধন চট্টোপাধ্যায় / ৮২ / ঐ
পালা-বদল না পালা-জ্বর / সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় / ৮৫ / জানু-ফেব্রু
রাজনীতি মানবিক হোক / সুনন্দ সান্যাল / ৮৮ / জানু-ফেব্রু
পরিবর্তন চাই, অন্য পরিবর্তন / সুমিত চৌধুরী / ৮৯ / জানু-ফেব্রু
পরিবর্তন— মতাদর্শের / সমরেশ মিত্র / ৯৩ / জানু-ফেব্রু
দিন বদলায় না / সব্যসাচী দেব / ৯৬ / জানু-ফেব্রু
বিনায়ক সেন রাষ্ট্রদ্রোহী? / পুণ্যব্রত গুণ / ৭ / জানু-ফেব্রু
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র : উজান স্রোতে সাঁতারু/আশীষ লাহিড়ী/২৭/মার্চ
বিদ্রোহী ব্রহ্মবান্ধব / সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় / ২৬ / মার্চ
নারীর 'সাংস্কৃতিক নির্মাণ' / রূপা আইচ / ৫ / মার্চ
ক্ষমতা, প্রতিরোধ ও সীমিত গণতন্ত্র / প্রদীপ বসু / ১৩ / মার্চ
নির্বাচন ও গণতন্ত্র-ভাবনা/ পার্থ সারথি/ ১১ / এপ্রিল
মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ... / সন্তোষ রাণা / ১৫ / এপ্রিল
নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনা / শুভাশিস মুখোপাধ্যায় / ২৬ / এপ্রিল
জইতাপুর: ভারতের ফুকুসিমা? / সমরেশ মিত্র / ৩৩ / এপ্রিল
পরমাণু বিদ্যুৎ বর্জনের দাবি / সুজয় বসু / ৩৮ / এপ্রিল
আমাদেরই সন্তান-সন্ততি / অশোক মিত্র / ১৩ / মে
লাদেন হত্যা: পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড / নোয়াম চমস্কি / ১৫ / মে
লাদেনের 'জেহাদ' ও সন্ত্রাস / পার্থ সারথি / ১৬ / মে
কে বড় সন্ত্রাসবাদী / মিতা দত্ত / ১৯ / মে
লাদেন ও সাম্রাজ্যবাদ / দীপংকর চক্রবর্তী / ২০ / মে
জিন পরিবর্তন... মুনাফা / শুভ্রকেতন বসু / ২১ / মে
জিন-পরিবর্তিত খাদ্য: কেন শঙ্কিত? / সমরেশ মিত্র / ২৪ / মে
রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা ও রাষ্ট্র /অংশুমান ভৌমিক / ৩২ / মে
চার অধ্যায়: পঞ্চমাংক বা পঞ্চত্বপ্রাপ্তি / জয়ন্ত দাস / ৩৬ / মে
সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি চাই/সঞ্জীব আচার্য্য/৮/জুন
পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট কী ভুল করেছে / অশোক মিত্র / ১৫ / জুন
প্রকৃত পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামের... / অরিন্দম সেন / ১৭ / জুন
বামফ্রন্ট পরাজিত বামপন্থার ভবিষ্যৎ... / পার্থসারথি / ২০ / জুন
শুরু হোক প্রকৃত বামপন্থার পুনরুজ্জীবন / সুকান্ত রায় / ২৭ / জুন
বামপন্থীদের বিপর্যয়ের কারণ / রতন খাসনবিশ / ৩০ / জুন
বিধানসভা নির্বাচনের হালহকিকৎ / দেবাশিস ভট্টাচার্য / ৩৩ / জুন
বন্দীমুক্তি আন্দোলন / দীপংকর চক্রবর্তী / ১৩ / জুলাই
ভারতে বামপন্থার ভবিষ্যৎ / সুমন্ত ব্যানার্জী ২১ / জুলাই
সম্মানের সঙ্গে উন্নয়ন / ১৩ / জুলাই
বিশ্বজোড়া খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা... /অপরাজিতা মুখার্জী/২৫/জুলাই
খাদ্য নিরাপত্তা ও দ্বিতীয় ইউপিএ.../রতন খাসনবিশ/৩০/জুলাই
পঃবঙ্গে কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা / পার্থ সারথি / ৩৬ / জুলাই
খাদ্য সুরক্ষা / দেবিন্দর শর্মা / ৩৬ / জুলাই
অধিকারের রাজনীতি... / নীলাঞ্জন দত্ত / ৪ / আগস্ট
খুচরো ব্যবসায় বিদেশি লগ্নি / সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় / ৬ / আগস্ট
তদন্ত কমিশন... / সমরেশ মিত্র / ১১ / আগস্ট
পরমাণু শক্তি বর্জন / সুজয় বসু / ১৬ / আগস্ট
দলতন্ত্র থেকে জনশক্তি / শুভংকর চন্দ / ১৯ / আগস্ট
ইউরোপ জ্বলছে / সুচরিতা সেন / ৯ / সেপ্টে-অক্টো
আন্না-আন্দোলন : গণতন্ত্র-বিনাশী.../সুমিত চৌধুরী/১২/ঐ
খুচরো বাজারে বিদেশি বিনিয়োগের... /অভি দত্ত মজুমদার/১৬/ঐ
পেনশন বিল: বাজারে ধস্ নামলে ভবিষ্যতেও ইতি/প্রণব দে/২০/ঐ
উৎপল দত্ত / বিভাস চক্রবর্তী / ২৪ / সেপ্টে-অক্টো
গণপতি-র সঙ্গে সাক্ষাৎকার / ৫৩ / সেপ্টে-অক্টো
ভারতে 'মাওবাদ' / দীপংকর চক্রবর্তী / ৬৫ / সেপ্টে-অক্টো
ভারতে মাও-অনুসারী রাজনীতির ধারা/সমরেশ মিত্র /৭৯ /ঐ
প্রতিরোধের একচ্ছত্র অধিকার.../গৌতম নাভলাখা/৯৩/ঐ
বিপ্লবী সেই নতুন বসন্ত কবে আসবে? /বার্নার্ড ডি' মেলো /৯৯ /ঐ
সিপিআই(মাওবাদী)...মূল্যায়ন/অরিন্দম সেন /১০৩/ঐ
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মাও-চিন্তাধারা/কে এন রামচন্দ্রন /১০৯/ঐ
মাওবাদ ও ক্ষমতা দখলের রাজনীতি /রতন খাসনবিশ/১১৩/ঐ
"মাওবাদ" ও আজকের ভারতে তার প্রয়োগ /সুকান্ত রায়/১২২/ঐ
মাওবাদী রাজনীতি ও ভারতের সমাজ-বাস্তবতা/পার্থসারথি/১২৯/ঐ
নকশালবাড়ি : একটি মূল্যায়ন/সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়/১৩৫/ঐ
মার্কিন মুলুকেও সদর দপ্তরে কামান.../দীপ্র চৌধুরী/১০/নভেম্বর
আমরা ৯৯ শতাংশ / আনু মুহাম্মদ / ১৪ / নভেম্বর
পশ্চিমবঙ্গে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পি-পি-পি মডেল/সিদ্ধার্থ গুপ্ত/১৬/নভেম্বর
গণতান্ত্রিক অধিকার আন্দোলনের সংগঠক.../কাত্যায়নী/২১/নভেম্বর
ভারতে অধিকার আন্দোলনের দিশা/দীপংকর চক্রবর্তী/৩০/নভেম্বর
লিবিয়া : আমেরিকার আফ্রিকা... / দীপ্র চৌধুরী / ১৬ / ডিসেম্বর
ডলার-সংকটের নেপথ্য কাহিনী / ১৯ / ডিসেম্বর
জইতাপুর... / শুভাশিস মুখোপাধ্যায় / ২০ / ডিসেম্বর
শিক্ষা অর্ডিন্যান্স / সলিল বিশ্বাস / ২২ / ডিসেম্বর
বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স / দেবর্ষি চক্রবর্তী / ২৬ / ডিসেম্বর
দারিদ্রের রেখাচিত্র / প্রণব দে / ২৮ / ডিসেম্বর
রাজনীতি তলিয়ে যায়.. / সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় / ৩২ / ডিসেম্বর
'আধার'... / সমরেশ মিত্র / ৩৬ / ডিসেম্বর

কবিতা

সব্যসাচী দেব / বিশ্বজিত সেন / মৃদুল দাশগুপ্ত / ১২ / জানু-ফেব্রু
বিশ্বকাপ ২০১১ / বিশ্বজিত সেন / ২ / এপ্রিল
আলো নেই / বিশাল ভদ্র / ২ / এপ্রিল
ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ-এর কবিতা / ৩১ / মে
একুশ শতকের 'প্রশ্ন' / রাজেশ দত্ত / ৪০ / জুলাই
শঙ্খ ঘোষ / সব্যসাচী দেব / অশোক চট্টোপাধ্যায় / বিশ্বজিত সেন / সমরেন্দ্র বিশ্বাস / সৃজন সেন / বিশ্বনাথ গরাই / সুদীপ চক্রবর্তী / সুকমল ঘোষ / ২৩, ৪৭-৫০ / সেপ্টে-অক্টো
যুদ্ধ / অশোক চট্টোপাধ্যায় / ৩১ / ডিসেম্বর
'স্বপ্ন' / অর্জুন রায় / ৩১ / ডিসেম্বর

গল্প

অলীক জল / অভিজিৎ সেনগুপ্ত / ৩০ / সেপ্টে-অক্টো
সন্ত্রাস / দীপঙ্কর দাস / ৩৬ / সেপ্টে-অক্টো
কৃষ্ণকথা / মীনাক্ষী সেন / ৪০ / সেপ্টে-অক্টো

ডিসেম্বর ২০১১ v ১৫ টাকা

iNÛß£ïj : Å÷ºòË £î éº¢Ëî–

লিবিয়া কাণ্ড q শিক্ষায় নতুন অর্ডিন্যান্স
পঞ্চায়েতে আমলাতন্ত্র q জঙ্গলমহলে ‘পরিবর্তন’
দারিদ্ররেখা বিতর্ক q কোদাইকুলামে গণ প্রতিরোধ
রোগী বিক্রির ব্যবসা q মেট্রো চ্যানেল বিতর্ক
দুর্নীতি ও রাজনীতি q ‘আধার’

চালংাচ াপিরাে

াঙ্কশি ব্রীব াে্যঅ চতীদ্রউ তক্পপ্র

াতকাশীানাহ ণ্য চাচভ ষ্ফিালচাষ্ক চাত

[illegible]

ঢর্যানীলী (াঃ) ত্যষ্ট্রীাসূ্ডই াকাতঁ

াভাকাল্ক p ঠষ্ক্রি কোাঁ ,৭৫

arunodaya1945@yahoo.co.in

POSTAL REGN. NO. : WB / BRS / RNP-105 / 2007-09 R.N.I REGN. NO. : 12026/65

ANEEK q 48TH YEAR : 6TH ISSUE q DECEMBER 2011 q RUPEES FIFTEEN ONLY

অনীক

জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১২ বিশেষ সংখ্যা

Áîíû‰ ï¸Ü°îÌû£Í ˜ñA ˜ÛN

ক্রোড়পত্র

úéÅîf ï¸Ü°îä

প্রকাশিত হবে জানুয়ারি-র তৃতীয় সপ্তাহে

---

v পত্রিকা সংক্রান্ত ঘোষণা v

q অনীক প্রতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

q সাধারণ সংখ্যার দাম ১৫ টাকা।

q গ্রাহক চাঁদার হার ১৫০ টাকা। যে কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

q গ্রাহক চাঁদা পাঠালেই গ্রাহক করে নেওয়া হয় এবং বুকপোস্টে পত্রিকা পাঠানো হয়।

q পিপলস বুক সোসাইটি-র প্রযত্নে মানি অর্ডারে/হাতে টাকা পাঠাতে পারেন। চেক হলে তা 'Aneek' নামে হবে।

q গ্রাহক চাঁদা নবীকরণের ক্ষেত্রে, চাঁদা সময়মতো পরিশোধ না করলে, চাঁদা শেষ হবার পরের সংখ্যা গ্রাহক চাঁদা (১৫০ টাকা) + ভিপি ডাক খরচ (২৫ টাকা) ধরে ভিপি-তে পাঠানো হয়।

....

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

অনীক : যোগাযোগের ঠিকানা

অনীক। প্রযত্নে : পিপলস্ বুক সোসাইটি। ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট।
কলকাতা - ৭০০ ০০৯ (*ফোন :* ০৩৩-২২১৯-৯২৫৬)

দীপংকর চক্রবর্তী (স্বত্বাধিকারী) কর্তৃক প্রযত্নে/পিপলস বুক সোসাইটি, ১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রাঃ লিঃ, গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : দীপংকর চক্রবর্তী